২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৯ ■ আনন্দমেলা পত্রিকা ■ সাত টাকা

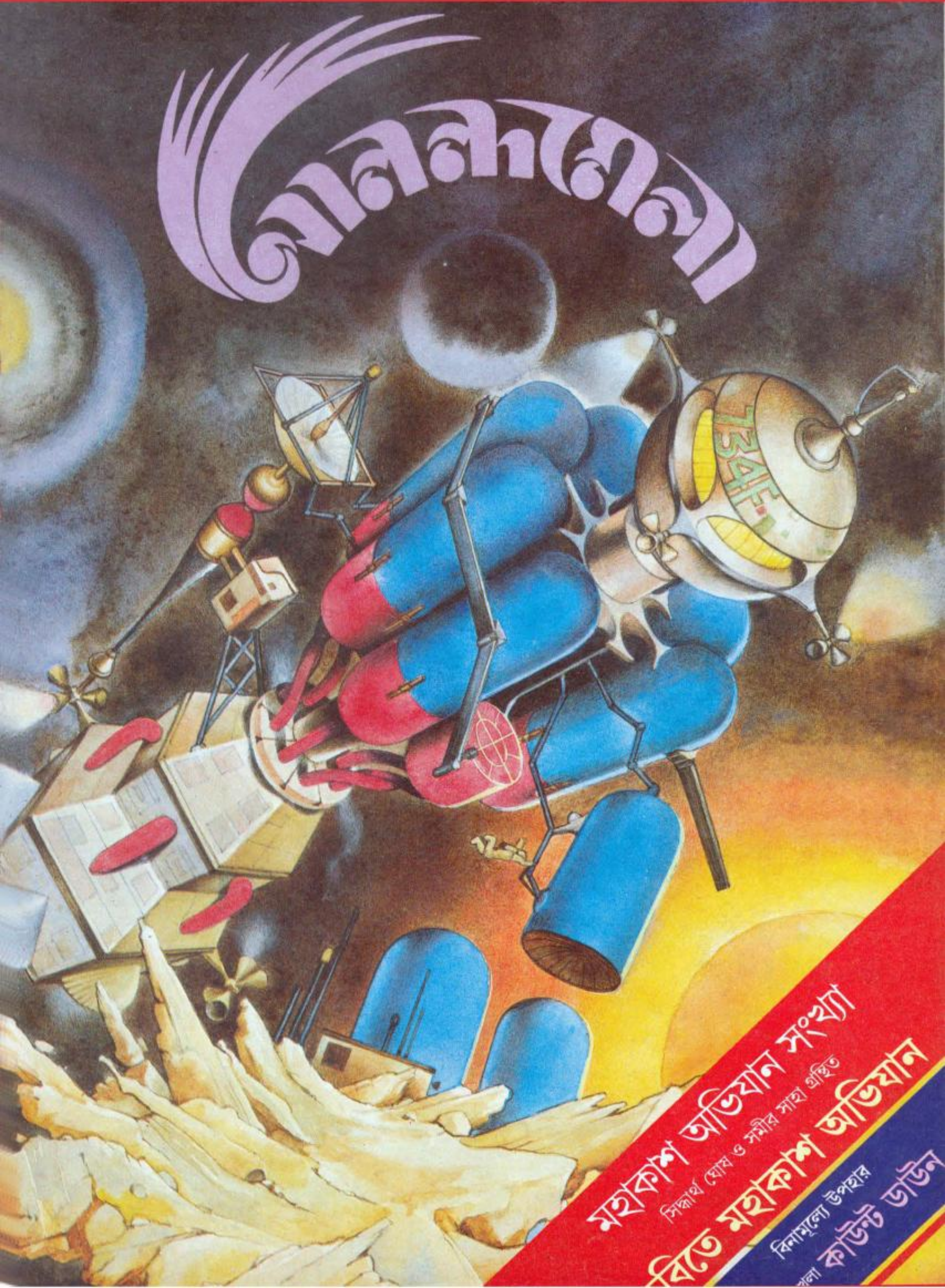

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - বুকলাভার

স্ক্যান করেছেন - বুকলাভার

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা আপনি স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে শীঘ্রই নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

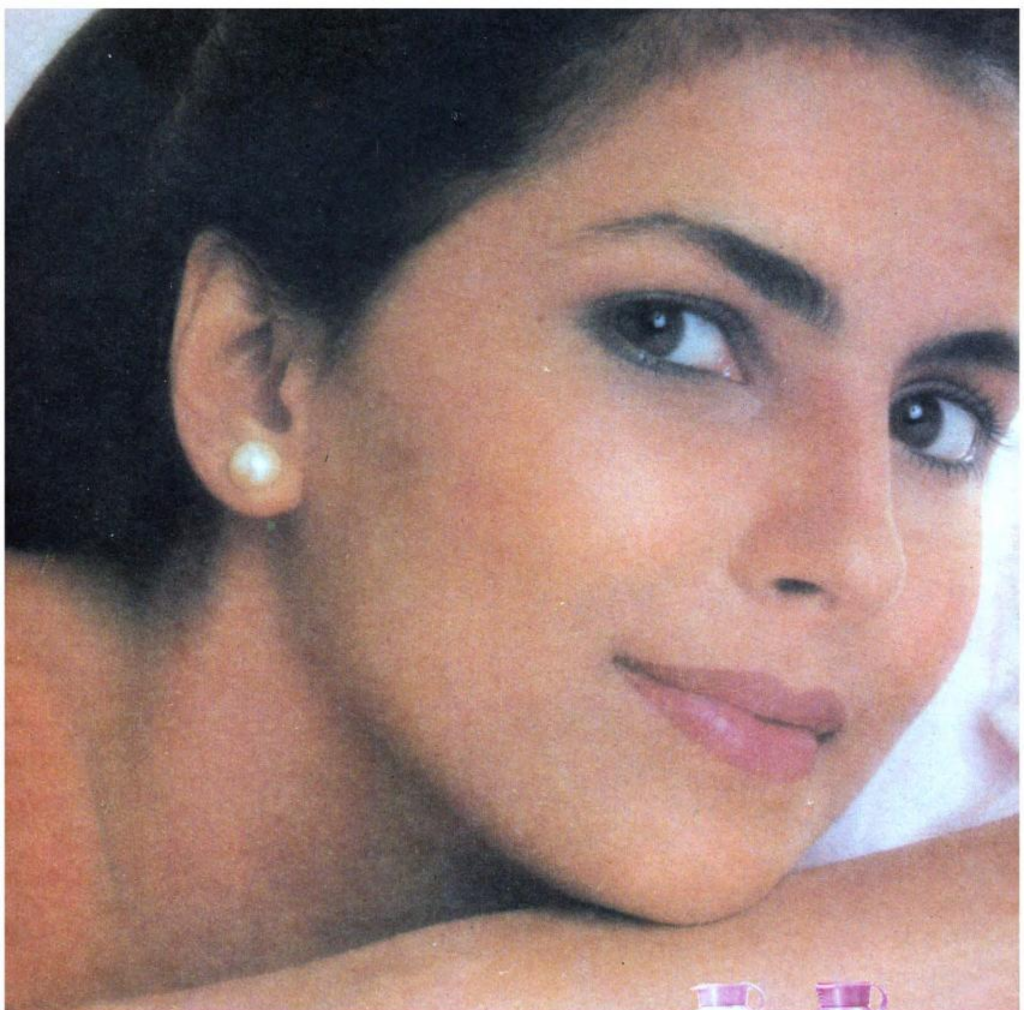

আপনার রঙরূপের বয়েস কি আপনার আসল বয়েসের চেয়েও বেশী দেখাচ্ছে?

আপনার রঙরূপের জৌলুষ কাল কেমন থাকবে, তা নির্ভর করে, আজ আপনি তার কিভাবে দেখাশোনা করছেন, তার ওপর। কারণ, বয়েস বাড়ার সাথে সাথে,ত্বকের আর্দ্রতা কমে যেতে থাকে—তাই, দরকার, জনসন্স বেবী লোশন-এর ময়েশ্চারাইজিং-এর গুণ।
এ পাবেন আপনার বেছে নেওয়ার মত দুটি ফর্মুলেশনে—লোশনটি ত্বকের গভীরে ঢুকে কাজ করে, আর এর বিশেষ ময়েশ্চারাইজিং গুণ ত্বকে পুষ্টি যোগায়—আর, আপনার ত্বক অপূর্ব কোমল ও তরতাজা ক'রে রাখে, ফলে আপনার রঙরূপেও যেন চির-বসন্তের ছোঁওয়া লাগে!

রেগুলার
শুষ্ক ত্বকের জন্যে এক বিশেষ ময়েশ্চারাইজারযুক্ত উপাদানের মিশ্রণ

লো অয়েল
তেলতেলে ত্বকের জন্যে হাল্কা, সূক্ষ্ম ফর্মুলা

জনসন্স বেবী লোশন

কারণ, নরম ও মোলায়েম ত্বক আপনার বয়স গোপন রাখে।

জনসন অ্যান্ড জনসন

এল এইবেলা মজার নতুন খেলা...
ফ্রিসবী
বিনামূল্যে
ফ্রিসবী !
প্রতি ৫০০ গ্রামের চকলেট
কমপ্লান টিনের সঙ্গে
কমপ্লান®
সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার
Complan
CHOCOLATE FLAVOUR
এখন আপনার সোনামণিকে দিন পুষ্টিকর আহারের সঙ্গে এক খেলা চমৎকার ! ওদের খেলতে দিন কমপ্লান ফ্লাইং ফ্রিসবী,এক উড়ন্ত চরকী । দেখুন হাসি-খেলা করে, ওরা কেমন তরতরিয়ে বাড়ে ।
* বর্তমানে নির্ধারিত বাজারগুলিতেই পাওয়া যাচ্ছে ।

GL/13/234 BEN

Disproportionate
Returns for
SMALL
INVESTMENTS
&
What more &
Old age Pension too.

INVEST in your CHILD'S STUDIES.

In doing so:
1) You have done your duty to your child.
2) You have assured him good future too.
3) You have insured your future too.

What steps
You have to take?
ADMISSION TO
TURNING POINT
SCHOOL

Can be a TURNING
POINT
in the life of your child.

* **An Exclusively English Medium Boarding School**

Admission open from
Class I to VII.
One class will be added
each year till Class X.
(CBSE syllabus)
It is a SCHOOL
Sponsored & run
by

LINKMAN INSTITUTE

52/B Rash Behari Ave Jn.
(Lane opp. Gurudwara)
Calcutta 700 026
Mon-Sat: 6 am—8 pm. Sun: 12 noon—6 pm

Enquiries: Phone: 46-5137.

* The School is within greater Calcutta.

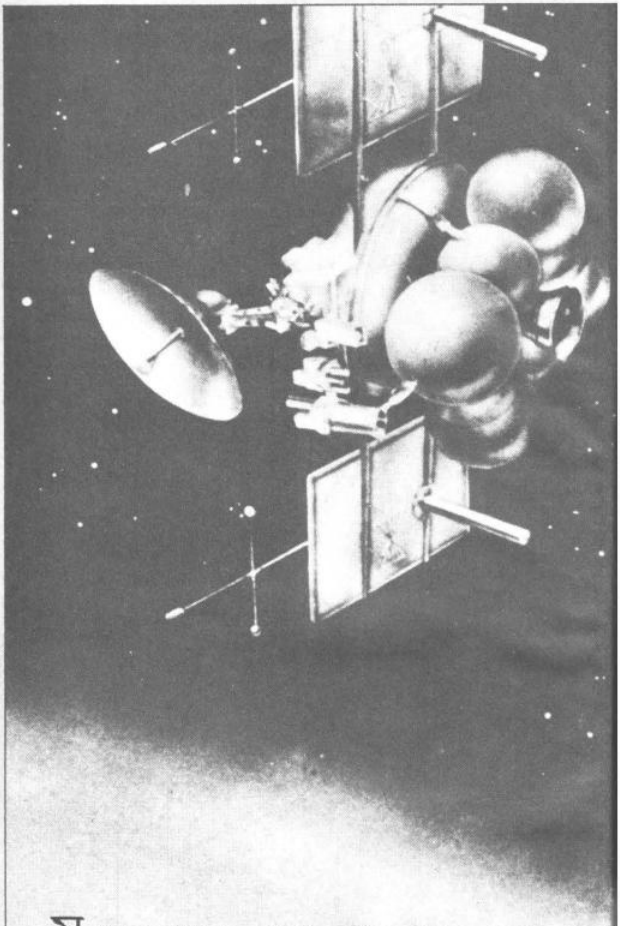

মহাকাশ অভিযানের বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনার রোমাঞ্চকর বিবরণই শুধু নয়, অজস্র ফোটোগ্রাফ ও নকশা গেঁথে 'ছবিতে মহাকাশ অভিযান'-এ গড়ে উঠেছে মানুষের মহাকাশ বিজয়ের কালানুক্রমিক ইতিহাস। বাংলায় মহাকাশ অভিযানের এই প্রথম অ্যালবামটির গ্রন্থনা করেছেন সিদ্ধার্থ ঘোষ ও সমীর সাহা। সেইসঙ্গে আছে সিদ্ধার্থ ঘোষ পরিকল্পিত আশ্চর্য খেলা 'কাউন্ট ডাউন'। পৃথিবী থেকে রকেটে চড়ে রওনা হয়ে কে আগে পৌঁছবে চাঁদে! দারুণ প্রতিযোগিতা!

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অস্থায়ী সম্পাদক অভীক সরকার। দাম সাত টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

মহাকাশ অভিযানের সচিত্র কাহিনী

ছবিতে মহাকাশ অভিযান সিদ্ধার্থ ঘোষ, সমীর সাহা ৭

আশ্চর্য খেলা

'কাউন্ট ডাউন' ৫০
কাউন্ট ডাউন খেলার নিয়ম ৯৮

সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ)

আর্গোস শিশিরকুমার দাশ ৭১

গল্প

প্রতিবন্ধী হরিণ দেবব্রত মৈত্র ৬৩

ধারাবাহিক উপন্যাস

উদাসী রাজকুমার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৫৬
সোনার গণপতি হিরের চোখ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৬৬

কমিক্স

রোভার্সের রয় ৯৩, টারজান ৬১, গাবলু ৬২, টিনটিন ৮৭, ব্যাটম্যান ৮৯

কবিতা

এই শীত সুনীল বসু ৯১
পড়া এবং খেলার ফাঁকে শিবময় দাশগুপ্ত ৯১

বিদ্যালয়-পরিচিতি

রায়গঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় নীরদ রায় ৫৯

খেলাধুলো

প্রথম ইংলিশ ক্রিকেট-দলের ... সুব্রত সরকার ৫৩
মাঝমাঠের লড়াই গৌতম সরকার ৫৪
শিরোনামে উষা ও মঞ্জরেকর অনুপম সরকার ৫৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিচাপাটি ৬, আকাশ চেনো ৬৮, শব্দসন্ধান ৭৯, আকাশে ওড়ার কথা ৮২, কুইজ ৮৩, চেনা না-চেনা ৯৫, নানারকম ৯৬

প্রচ্ছদ

বিমল দাস

সহকারী সম্পাদক □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদকীয় বিভাগ □ সিদ্ধেশ্বরনাথ ভার্মা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী, বাদল ঘোষ, বিমলকুমার পাল
শিল্প নির্দেশক □ অমিয় ভট্টাচার্য
সহযোগী □ প্রবীর সেন, দেবাশিস সেনগুপ্ত

৫৫

আর একটি বছর শেষ হয়ে এল। আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর আসরে অনেকেই সুনাম অর্জন করেছেন। পি টি উষা বহু পদক ভারতকে এনে দিয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তরুণ ক্রিকেটার সঞ্জয় মঞ্জরেকর। তাঁর নাম এখন মুখে মুখে।

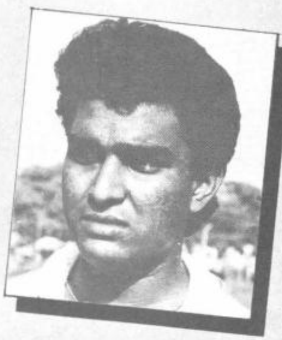

আগামী সংখ্যায়

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদকাহিনী

প্রত্নচর্চায় নতুন যুগ

শান্তনু চক্রবর্তীর বিজ্ঞান-নিবন্ধ

কোথায় খুঁজে পাই

গৌতম চক্রবর্তীর নিবন্ধ

আশার দশক নব্বই

পথিক গুহর বিজ্ঞান-আলোচনা

বিজ্ঞান : নব্বইয়ের দশকে

আবুল বাশারের সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ)

হালুম হলেই বাঘ হয় না

গিরিধারী কুণ্ডুর গল্প

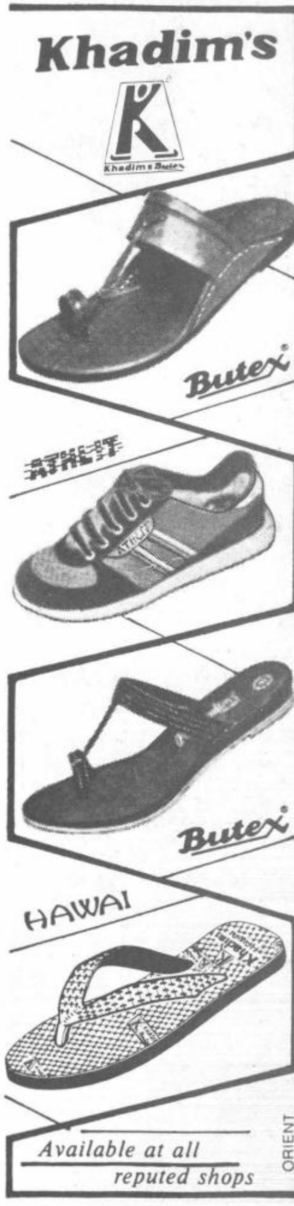

অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে জানে

অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় যে সেই ব্যাটম্যান আমার প্রিয় পত্রিকা 'আনন্দমেলা'র পাতায় দেখে খুব খুশি হলাম। ব্যাটম্যানের সৃষ্টিকর্তা 'বব কেন' কাজ করার ফাঁকে একদিন হঠাৎই তাঁর কলমে ধরা দিল বিশেষ এক চরিত্র, ব্যাটম্যান। ব্রুস ওয়েন ছোটবেলাতেই চোখের সামনে দেখেছিল, তার বাবা-মায়ের হত্যা, তখন থেকেই সে অপরাধীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞা করেছিল। দিনের পর দিন নিজেকে তৈরি করেছে ব্রুস; সেই হয়ে উঠেছে, দুর্ধর্ষ ব্যাটম্যান। ব্যাটম্যানের কোনওই অতিমানবীয় শক্তি নেই। তার শক্তি তার বুদ্ধিতে, তার দেহে। ব্রুসই যখন বাদুড়ের মুখোশ আর কালো জোব্বা পরে, তখনই সে হয়ে ওঠে আমাদের সবার প্রিয় ব্যাটম্যান। অনেক পরে ব্যাটম্যানের সঙ্গী হয় 'রোবিন'। ১৯৩৯ সালে ডিটেকটিভ কমিক্স পত্রিকার পাতায় যার আবির্ভাব, আজ পঞ্চাশ বছর পরেও সেই ব্যাটম্যান সমান জনপ্রিয়। পঞ্চাশতম বর্ষে ব্যাটম্যানকে আনন্দমেলা'র পাতায় হাজির করে আনন্দমেলা আবার প্রমাণ করল তার শ্রেষ্ঠত্ব।

নিবেদিতা ব্যানার্জি
অষ্টম শ্রেণী
গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস' স্কুল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা

আনন্দমেলা ৪ অক্টোবর সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী 'শারদোৎসব' পড়লাম। খুব ভাল লাগল। বিশেষ করে 'প্রতিমার বদলে সেবার ঘটপুজো' লেখাটিতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা আমাদের তখনকার ইংরেজ পুলিশদের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়। ব্রিটিশ পুলিশরা যে কতটা নির্মম, নির্দয়—তার পরিচয় আমরা সে-সময়ের বিভিন্ন ঘটনা থেকে জানতে পারি। কিন্তু আমরা ভাবতেও পারি না যে, 'দেশদ্রোহিতা' অপবাদ দিয়ে দুর্গাপুজোকে বন্ধ করে দেবে।

স্বাতী ভট্টাচার্য, মনিরুজ্জামান ও সুখেন্দু
উত্তর ২৪ পরগনা

আমি আপনাদের আনন্দমেলা পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। ৪ অক্টোবর সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী 'শারদোৎসব' আমার খুব ভাল লেগেছে। বেশি ভাল লেগেছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রতিমার বদলে ঘটপুজো'। তা ছাড়া নতুন 'চেনা না-চেনা' এবং 'আমি' বিভাগ দুটিও প্রশংসনীয় এবং সুন্দর।

সুদীপ্ত বাগচী
ঝাপানডাঙা, বর্ধমান
বর্ণিতা রায়
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি

'আনন্দমেলা কুইজ প্রতিযোগিতা'র ফল

(১) ইয়ুথ হস্টেলস আন্দোলন কোন দেশে প্রথম শুরু হয়েছিল?
উত্তর: জার্মানিতে।

(২) ক্রিকেট-দুনিয়ায় কাকে 'মিঃ মিলিয়ন্স' নামে ডাকা হত?
উত্তর: কেরি প্যাকারকে।

(৩) ইংরেজি ছবি 'ব্যাক টু দা ফিউচার'-এর অনুপ্রেরণায় দূরদর্শনের একটি সিরিয়াল তৈরি হয়েছে। টিভি সিরিয়ালটির নাম কী?
উত্তর: ইন্দ্রধনু।

(৪) বঙ্গ-বিভাগ ঘোষণা করা হয়েছিল ১৬ অক্টোবর, ১৯০৫। রবীন্দ্রনাথ এই দিনটিকে কীভাবে পালন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন?
উত্তর: রাখী-বন্ধনের দিন হিসেবে।

(৫) কলকাতার ৩০০ বছর হতে চলল। কোন শহর এ-বছর তার ৩৫০তম বর্ষ উদযাপন করছে?
উত্তর: মাদ্রাজ।

(৬) উত্তর মেরু হল ৯০° (উ)। চৌম্বকীয় উত্তর মেরুর অক্ষাংশ কত?
উত্তর: ৯২·৫ (প)

(৭) 'সিনদে ডাক' কী?
উত্তর: ভারতের প্রথম ডাকটিকিট।

(৮) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রাণীর নাম বলো।
উত্তর: গোল্ড ফিশ।

(৯) 'দা প্রিন্সেস রিমেমবার্স' কোন ভারতীয়ের আত্মজীবনী?
উত্তর: জয়পুরের মহারানি গায়ত্রী দেবীর।

(১০) সার এডউইন আর্নল্ড-এর 'দা লাইট অব এশিয়া' কবিতাটি কার জীবন নিয়ে লেখা?
উত্তর: বুদ্ধদেব।

(১১) কোন কুকুরকে মাঝেমধ্যে 'জার্মান বুলডগ' বলা হয়?
উত্তর: বক্সার।

(১২) বাইবেল-এ 'দা ডটার অব জিয়ন' বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: জেরুজালেম।

২৬ জুলাই 'আনন্দমেলা কুইজ প্রতিযোগিতা'র ফল এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল। আনন্দ পাবলিশার্সের ৭৫ টাকা মূল্যের বইয়ের কুপন পুরস্কার পাবে সল্ট লেক, সেক্টর-১-এর **দেবপ্রিয় সরকার**। বিজয়ীর কাছে কুপন ডাকযোগে যথাসময়ে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

গোয়েন্দা গল্প

আমি আনন্দমেলার একজন নিয়মিত পাঠক। আমার এই প্রিয় পত্রিকায় নিয়মিতভাবে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গোয়েন্দা-গল্প পড়তে চাই। আশা করি আমার এই অনুরোধ বিবেচনা করে দেখবেন।

দীপায়ন তরফদার
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস

শ্যামসুন্দর বসুর প্রচ্ছদকাহিনী 'ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস' প্রকাশিত হয়েছে আনন্দমেলা ১৫ নভেম্বর সংখ্যায়। লেখাটিতে রামনাথ বিশ্বাসের দুঃসাহসিক জীবনের অনেক অজানা তথ্য জানতে পেরে খুশি হলাম। দুর্নিবার ইচ্ছাশক্তির কাছে পর্বতপ্রমাণ বাধাবিপত্তিও যে তুচ্ছ প্রতিপন্ন হয়, এ-লেখা তার সার্থক উদাহরণ। এ-ধরনের আরও অনেক লেখা 'আনন্দমেলা' থেকে প্রত্যাশা করি।

পলাশ মণ্ডল
যুববিজ্ঞান সংস্থা, গোবরডাঙা
উত্তর ২৪ পরগনা

মহাকাশ অভিযানের সচিত্র কাহিনী

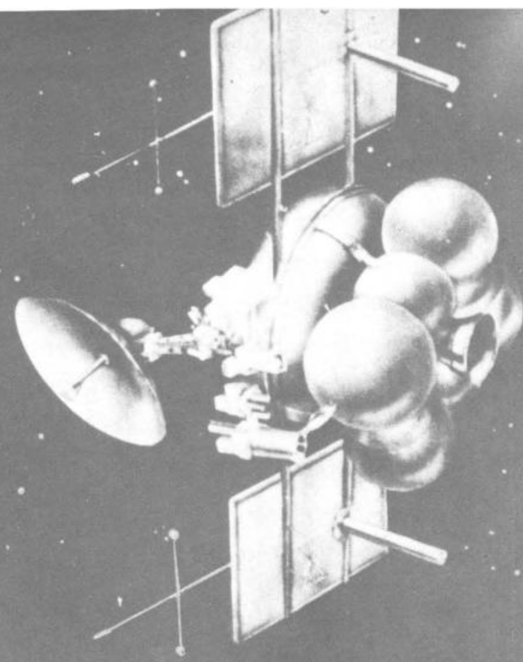

ছবিতে মহাকাশ অভিযান

মানুষের মহাকাশ অভিযানের স্বপ্ন দেখার কাল থেকে এই সচিত্র কাহিনীর শুরু। আকাশ পেরিয়ে মহাকাশে, পৃথিবী ছাড়িয়ে চাঁদে পৌঁছেও যা শেষ হয়নি। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরের যাত্রা সেরেও মানুষের তৈরি নভোযান এখনও অপ্রতিহত ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে অন্বেষণ। তারই রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্ত পরিবেশন করেছেন **সিদ্ধার্থ ঘোষ ও সমীর সাহা।**

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে উনিশ শতকের মাঝ অবধি মানুষ ঘন্টায় এক থেকে একশো মাইলের বেশি গতি অর্জন করতে পারেনি। পরবর্তী একশো বছরে এক লাফে সেই গতি ঘন্টায় হাজার মাইলে পৌঁছে গেল। তারপর ১৯৫০ থেকে ১৯৬০-র মধ্যে জেট প্লেনের শব্দকে হার-মানানো গতিকেও ম্লান করে দিল পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাকাশযানের অবিশ্বাস্য দৌড়। ঘন্টায় ১৮,০০০ মাইল। অবশ্য সৌর ও বিশ্বজগতের ঠিকানা জানার জন্য, মহাকাশের গ্রহ-তারাদের রহস্যময় গতিবিধির সন্ধান পেতে মানুষের বিজ্ঞানী মন প্রথম যে দিন উৎসুক হয়েছিল, সেই দিনই মহাকাশ অভিযানের সূচনা।

টলেমি

টলেমি-র 'আলমাজেস্ট' গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃথিবী পরিক্রমারত সূর্যের ছবি। বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু পৃথিবী, আর তাকে ঘিরে সূর্য চন্দ্র ও পাঁচটি গ্রহের আবর্তন। এদের ছাড়িয়ে নক্ষত্রখচিত মহাকাশ স্থির ও অবিচল। এই তত্ত্বের জনক ক্লডিয়াস টলেমাস টলেমি (৯০-১৬৮ খ্রি· পূর্বাব্দ)। প্রায় ১৫০০ বছর মানুষ এই ভুল তত্ত্ব মেনে চলে। কিন্তু তারাদের সঠিক অবস্থান জানা, নাবিকদের ভ্রমণের ভৌগোলিক মানচিত্র তৈরি ও মহাকাশচর্চায় ত্রিকোণমিতির ব্যবহারের জন্য তিনি স্মরণীয়।

কোপার্নিকাস

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের সময়ে পোলাণ্ডের নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) নিযুক্ত ছিলেন মহাকাশের রহস্য উন্মোচনে। জীবনভরা গবেষণার তথ্য সংবলিত বইটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর বছরে। তিনিই বলেন, সূর্যকে ঘিরে গ্রহরা বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করছে, পৃথিবী নিজের অক্ষে ঘূর্ণায়মান। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (চার্চ) তাঁকে অস্বীকার করলেও পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও পর্যালোচনা মারফত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে তিনি টলেমির তত্ত্বের ভুল ধরিয়ে দেন।

টাইকো ব্রাহে

ডেনমার্কের জ্যোতির্বিজ্ঞানী (১৫৪৬-১৬০১), শেক্সপিয়র-এর সমসাময়িক। মহাকাশের মানচিত্র (তারাদের অবস্থান সূচক) তৈরির উন্নত পদ্ধতি বার করে সারাজীবন গবেষণার পর তারাদের 'ক্যাটালগ' (তালিকা) প্রস্তুত করেন। পরীক্ষা করে তিনি প্রমাণ করেন টলেমির তত্ত্ব ভুল। তাঁর মৃত্যুর পরে গবেষণা চালিয়ে যান তাঁরই সুযোগ্য সহকারী কেপলার।

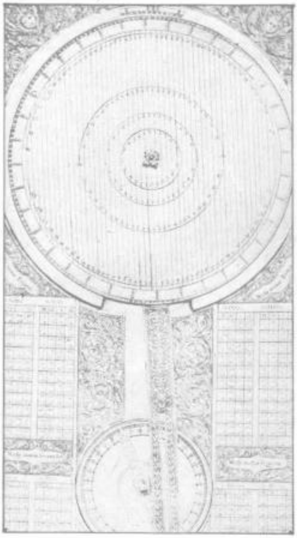

বাঁ দিকে, জোভিলাবে (Jovilabe)। গ্যালিলেওর তৈরি যন্ত্র। বৃহস্পতির উপগ্রহের অবস্থান নির্ণয়ে ব্যবহৃত। ডান দিকে, টাইকো ব্রাহে-র 'আকাশযন্ত্র', গ্রহ ও তারার অবস্থান ও চলাচল পর্যবেক্ষণের জন্য।

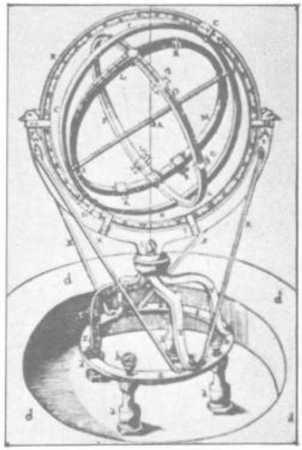

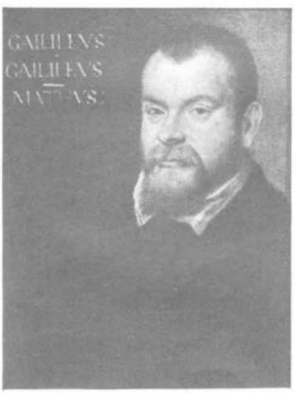

গ্যালিলেও গ্যালিলি

ইতালির পিসা শহরে জন্ম (১৫৬৪-১৬৪২)। সত্য আবিষ্কারের জন্য এক দিকে টেলিস্কোপ নিয়ে 'চাঁদের পাহাড়', বৃহস্পতির উপগ্রহ আবিষ্কার করেছেন, প্রণয়ন করেছেন মেকানিক্‌সের সূত্র। অন্য দিকে, চিন্তার স্বাধীনতা আর সত্য প্রকাশের অধিকারের জন্য আমরণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও যাজকদের সঙ্গে চালিয়েছেন লড়াই।

যোহান্‌স কেপলার

জার্মানিতে জন্ম (১৫৭১-১৬৩০)। কাজ করেন ব্রাহের সঙ্গে চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগ-এ। সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের তুলনায় এঁদের দুজনের চিন্তা ছিল বহু অগ্রসর। কেপলারের তিন সূত্র যেমন গ্রহবিজ্ঞানের ভিত, তেমনই নিউটনের কাজেরও শুরু সেখান থেকে।

আইজাক নিউটন

অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই ব্রিটিশ বিজ্ঞানীর (১৬৪২-১৭২৭) প্রণীত মূল গ্রন্থের নাম 'প্রিন্সিপিয়া'। নিউটনের অভিকর্ষের সূত্র, মহাকর্ষ গণিত ও মেকানিক্‌সের সূত্র অবলম্বনে রকেট নির্মাণের শুরু, শুরু মহাকাশ-অভিযানের। মহাকাশচর্চায় গ্রহ ও তারাদের পর্যবেক্ষণের জন্য 'রিফ্রেক্টিং টেলিস্কোপ'-এর আবিষ্কর্তা। পৃথিবী থেকে নিক্ষিপ্ত একটি বস্তু আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে, না পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ হয়ে ঘুরতে থাকবে, নাকি মহাশূন্যে উধাও হয়ে যাবে, তাও হিসেব করে বলা যায় নিউটনের গতিসূত্র দিয়ে।

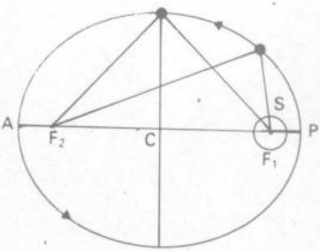

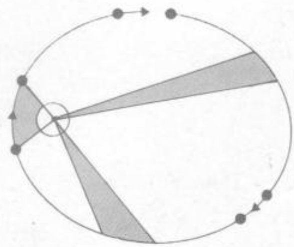

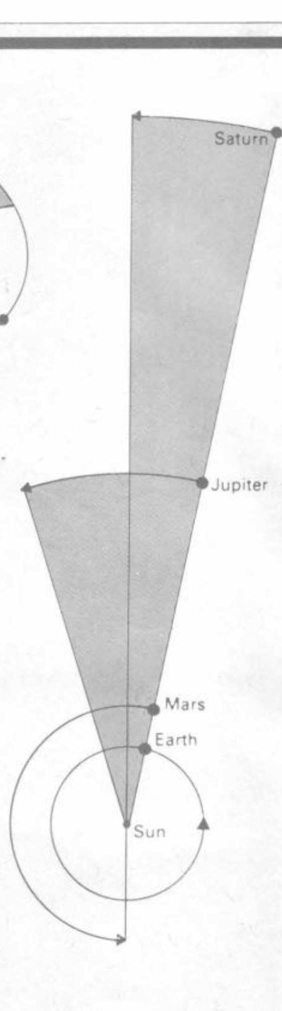

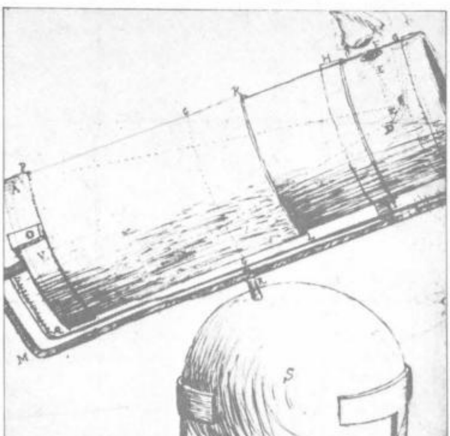

নিউটনের তৈরি রিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপ

কেপলারের প্রথম সূত্র : গ্রহগুলি সূর্যের চারধারে উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে ; সূর্য থাকে উপবৃত্তের এক ফোকাস-এ।

দ্বিতীয় সূত্র : সূর্যের কেন্দ্র থেকে কোনও গ্রহের কেন্দ্র পর্যন্ত টানা কাল্পনিক রেখা—সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল পেরিয়ে আসে।

তৃতীয় সূত্র : কোন একটি গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসতে যতটা সময় নেয় এবং গ্রহটি সূর্য থেকে মোটামুটি যতটা দূরে আছে—এই বিশেষ গ্রহের এই সময় ও দূরত্বের সঙ্গে অন্য কোনও বিশেষ গ্রহের এই সময় ও দূরত্বের একটা গাণিতিক সম্পর্ক আছে।

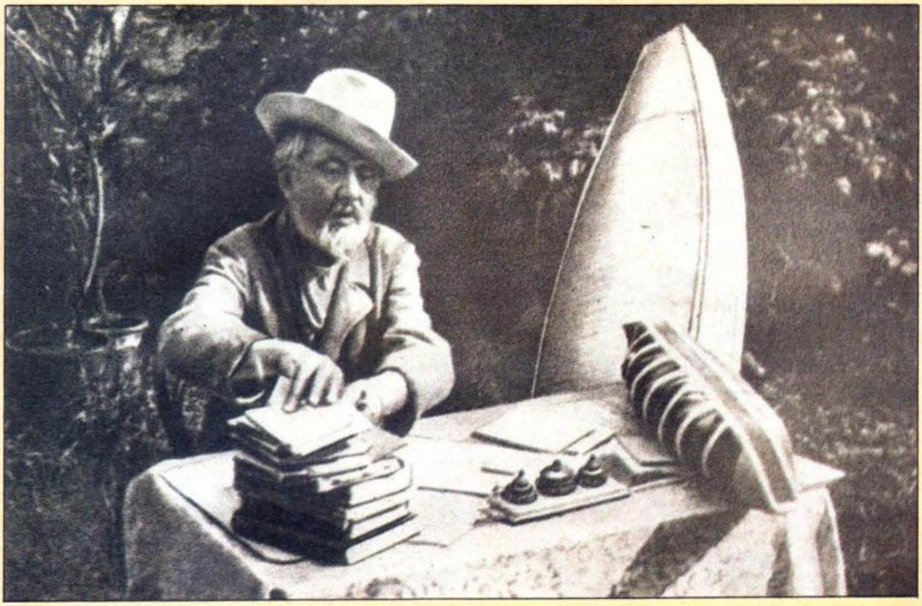

কন্‌সতানতিন সিওল্‌কোভস্কি (১৮৫৭-১৯৩৫)। বিজ্ঞানসম্মত রকেট-বিদ্যার জনক। রাশিয়ার একটি জেলা স্কুলের এই শিক্ষক ১৮৭৮ থেকে পৃথিবীর বন্ধন-মুক্ত হয়ে মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার মতো যন্ত্র নির্মাণের পরিকল্পনা শুরু করেন। তাঁর বিজ্ঞান-নির্ভর গবেষণাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কল্পবিজ্ঞানের কাহিনীকে বাহন করেন তিনি। 'প্রতিক্রিয়া মোটর', 'সোলার মোটর' (সোলার সেল), স্পেস স্যুট, আলোকরশ্মির সাহায্যে গ্রহান্তরে সংযোগ ইত্যাদির ব্যবহার বিষয়ে বহু সার্থক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তিনি।

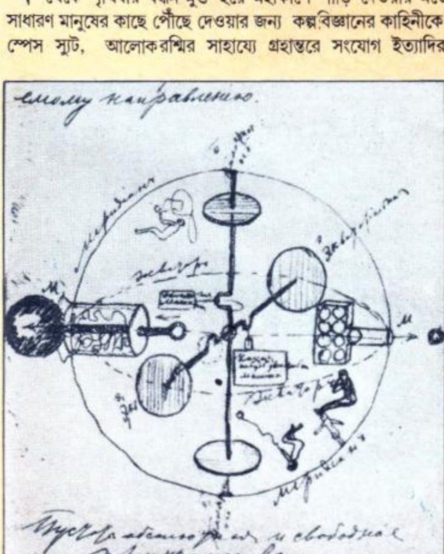

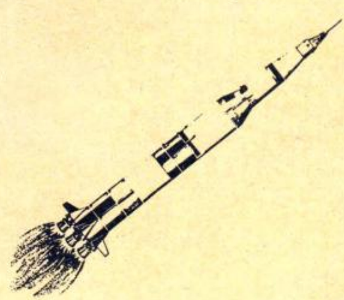

সিওল্‌কোভস্কি-র পাণ্ডুলিপি 'ফ্রি স্পেস' থেকে একটি পৃষ্ঠা। জেট-এঞ্জিন-চালিত একটি মহাকাশযানের ছবি। এই যানের ডান ধারের কামান থেকে গোলা ছোঁড়া হলে তারই প্রতিক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যায় এটিকে। মহাকাশযানের কেন্দ্রে রয়েছে একটি 'জাইরোস্কোপ' যন্ত্র, যার আবর্তন মহাশূন্যে যানটির অবস্থান পরিবর্তনে সহায়তা করতে পারে।

পৃথিবীকে ঘিরে বায়ুমণ্ডলের বিস্তার প্রায় ২০ কিলোমিটার উচ্চতা অবধি, যদিও ১০০০ কিলোমিটার অবধি বায়ুকণা আছে। নিউটনের আপেলের মতো সব জিনিসকেই পৃথিবী টানে নিজের কেন্দ্রের দিকে—যাকে বলে অভিকর্ষ। যার ফলে বস্তুর 'ওজন'। মহাকাশ-অভিযানের প্রথম পর্যায় এই বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে কোনও কিছু পাঠানো। বেলুন বা এরোপ্লেনে উড়তে গেলে লাগে হাওয়া। একমাত্র রকেটই পারে মহাকাশে, মহাশূন্যে ছুটে চলতে। বায়ুমণ্ডলের তোয়াক্কা না করে পৃথিবীর টান ছিড়ে বেরিয়ে যেতে পারে এমন ব্যোমযানই রকেট।

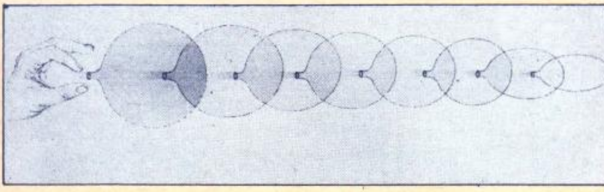

ছবির এই বেলুনটি সরলতম রকেটের উদাহরণ

রকেট তার গতি অর্জন করে নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুসারে : প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত মাপের প্রতিক্রিয়া আছে। এই সূত্র কাজে লাগিয়ে নিউটন যে বাষ্প-চালিত গাড়ির কথা ভেবেছিলেন তার ছবি দেওয়া হল। তার ওপরে একটি বদ্ধ পাত্র দেখানো হয়েছে। এই পাত্রে সৃষ্টি করা হয়েছে চাপ : চারদিকে চাপের মান সমান। কিন্তু পাত্রের একটি দিকে যদি ফাঁক থাকে, তবে সেদিকের চাপ লাঘব হবে। কিন্তু তার উলটো দিকের অংশে চাপের মান আগের মতোই থাকবে। ফলে পাত্রটি এই চাপ নিষ্ক্রমণের উলটো দিকে গতি অর্জন করবে। ঠিক এই কারণেই রকেট অর্জন করে তার ঘাত, যা তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যায়।

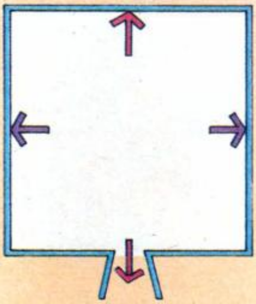

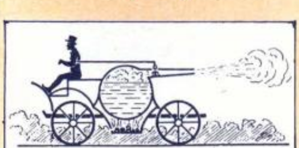

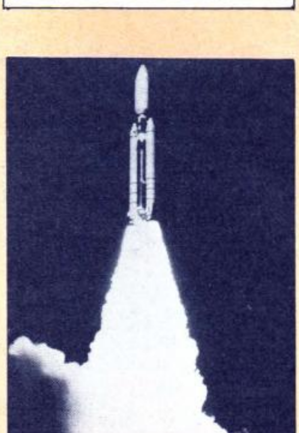

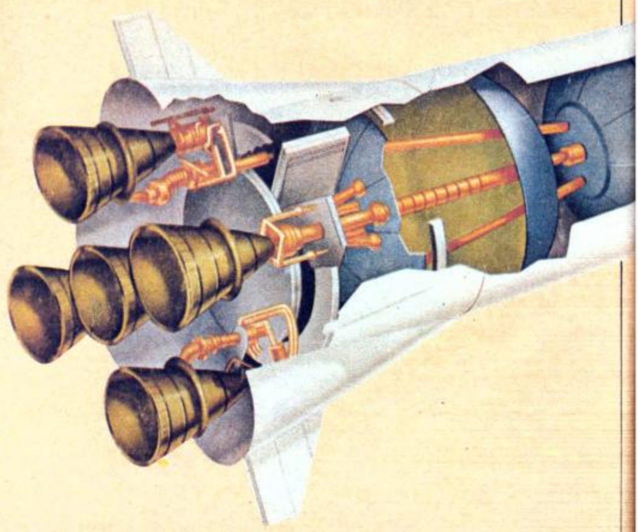

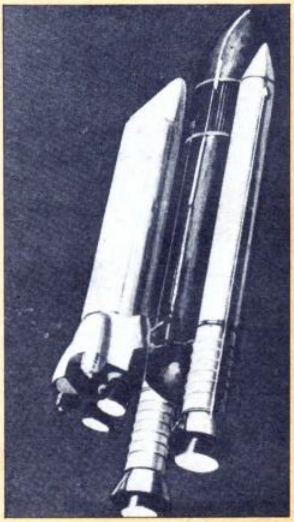

পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে ৮ কি· মি/সেকেন্ডে একটি বস্তুকে অনুভূমিকভাবে ছোঁড়া হলে সেটা একটা উপবৃত্তকার পথে চাঁদের মতো পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরতে থাকে। এই গতি বাড়তে বাড়তে ১১·২ কি· মি·/ সেকেণ্ড হলেই তবে পৃথিবীর বাধা কাটিয়ে একটি বস্তু মহাকাশের দিকে ছুটে যায়। একে বলে নিষ্ক্রমণবেগ (escape velocity) .

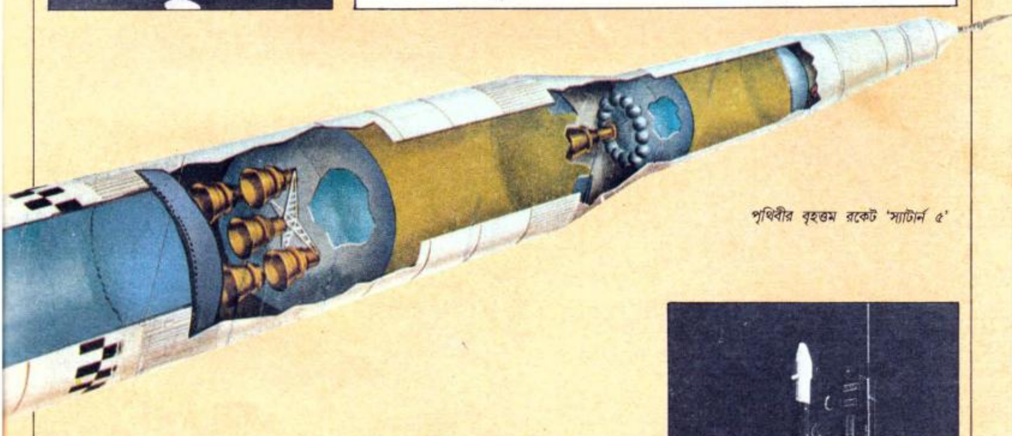

পৃথিবীর বৃহত্তম রকেট 'স্যাটার্ন ৫'

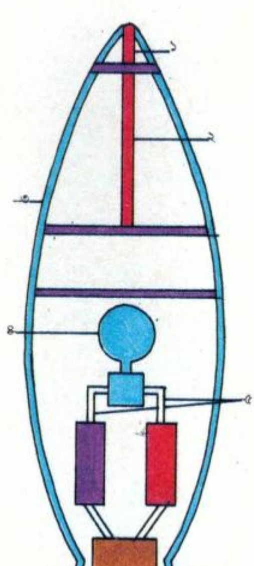

রকেটের বিভিন্ন অংশ
১—সাজ-সরঞ্জাম
২—নিয়ন্ত্রণ-কক্ষ
৩—ধাতু নির্মিত আবরণ
৪—পাম্প
৫—জ্বালানি ও অক্সিজেন
৬—রকেট মোটর
৭—নালীমুখ (নজ্‌ল)
৮—রকেটের পাখনা

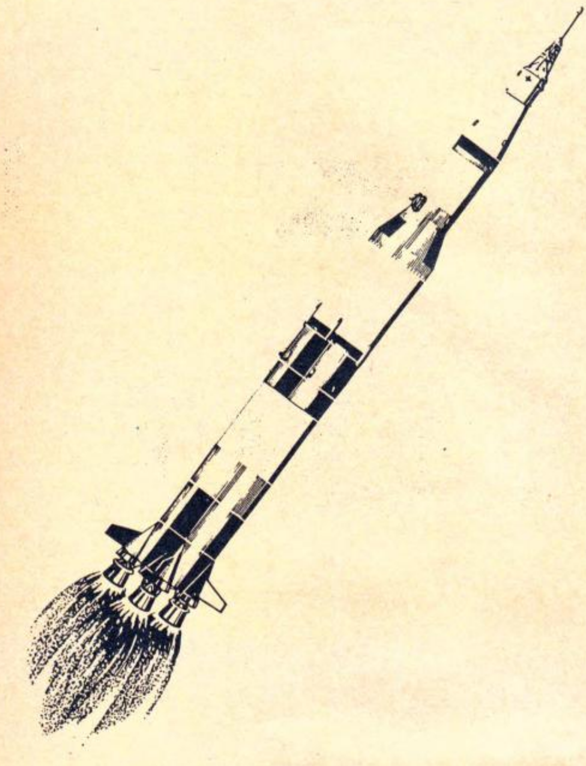

রকেটের এঞ্জিনের দহনই ঠেলে নিয়ে যায় রকেটকে। এই ঠেলা বা ঘাত (thrust) নির্ভর করে জ্বালানি পোড়ার হার ও উদ্ভূত গ্যাসের নিঃসরণ বেগের উপর। ঠেলার মাপ নেওয়া হয় পাউণ্ডে। এক পাউন্ড জ্বালানি এক সেকেন্ড ধরে পুড়লে যে ঘাত তৈরি হয়, তার নাম নির্দিষ্ট ঘাত, যা '১ সেকেন্ড নির্দিষ্ট ঘাত' বলে প্রকাশ করা হয়। রকেটের কাজ মহাকাশযান মহাকাশে পাঠানো। রকেটের ঘাত ব্যোমযানের ওজনের বেশি হলে তবেই সেটি মহাকাশে পৌঁছবে।

মহাশূন্যে অক্সিজেন নেই তাই জারক অক্সিজেনও বহন করতে হয় জ্বালানির সঙ্গে। পেট্রল ও তরল অক্সিজেন (LOX) পুড়িয়ে যে রকেট এঞ্জিনে ঘাত তৈরি হয়, তার নির্দিষ্ট ঘাত ৩০০ সেকেন্ড। স্যাটার্ন রকেট কিছু দূর ওঠার পর একটি পর্যায়ে তরল হাইড্রোজেন ও তরল অক্সিজেন পুড়িয়ে রকেটের ঘাত সৃষ্টি করা হয়। তখন তার নির্দিষ্ট ঘাত দাঁড়ায় ৪০০ সেকেন্ড। এই জাতীয় রকেটের সাহায্যেই সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা চাঁদ, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শুক্র, এমনকী, গ্রহমন্ডল ছাড়িয়ে প্রেরণ করেছে বহু মহাকাশযান।

পাশের ছবিতে একটি রকেটের মূল অংশগুলি দেখানো হয়েছে। জ্বালানি ও অক্সিজেনের জন্য আছে দু'টি পৃথক কক্ষ। পাম্প চালিয়ে জ্বালানি আর অক্সিজেনকে আনা হয় রকেট-এঞ্জিনে। এঞ্জিনের মধ্যে ঘটে দহন ও বিস্ফোরণ। এঞ্জিনের নীচে নজ্‌ল দিয়ে প্রচণ্ড বেগে গ্যাস বেরিয়ে আসে। নজ্‌লের কাজ এঞ্জিনের দহনজাত গ্যাসকে বাইরের দিকে যত বেশি সম্ভব গতিবেগ দেওয়া। রকেট থেকে বেরিয়ে-আসা গ্যাসের নিঃসরণ বেগ যত বেশি হবে রকেটও তত দ্রুত ওপরে উঠবে। রকেটের নীচের পাখনা তার গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে।

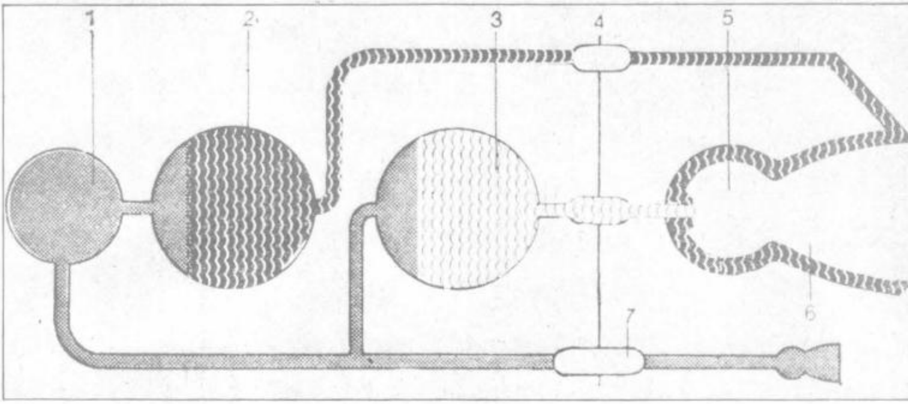

তরল জ্বালানির রকেট-এঞ্জিন
1—সংকুচিত গ্যাস, 2—জ্বালানি, 3—অক্সিডাইজার, 4—পাম্প, 5—জ্বলন-প্রকোষ্ঠ, 6—নজল, 7—টারবাইন

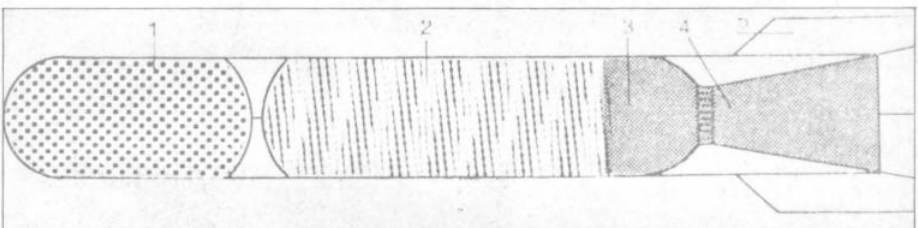

কঠিন জ্বালানির রকেট-এঞ্জিন
1—প্রয়োজনীয় লোড, 2—বারুদ, 3—জ্বলন-প্রকোষ্ঠ, 4—নজল, 5—স্টেবিলাইজার

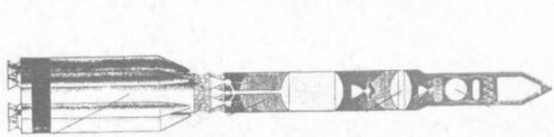

রকেটের জ্বালানি তরল হতে পারে, কিংবা কঠিন। কঠিন জ্বালানি বলতে গান-পাউডার বা বারুদ। আর তরল, নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণ। জ্বালানি কঠিন হোক বা তরল, মহাশূন্যে অক্সিজেন নেই, তাই জ্বালানি জ্বালানোর জন্য জারক অক্সিজেনকেও বহন করে রকেট।

নিউক্লিয়ার বা পারমাণবিক জ্বালানির কথাও বিজ্ঞানীরা চিন্তা করছেন। এই জ্বালানির জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখনও নিউক্লিয়ার শক্তি-চালিত রকেট তৈরি হয়নি।

তরল জ্বালানির রকেটে জ্বালানি ও জারক স্বতন্ত্রভাবে থাকে। তাই তার দহন সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তরল জ্বালানি পোড়া গ্যাসের নিঃসরণ বেগও কঠিন জ্বালানির রকেটের চেয়ে বেশি। কঠিন জ্বালানির রকেটে জ্বালানি ও জারক একসঙ্গে মেশানো।

তরল ও কঠিন জ্বালানিবিশিষ্ট দুই ধরনের রকেটের ছবি দেওয়া হল এখানে।

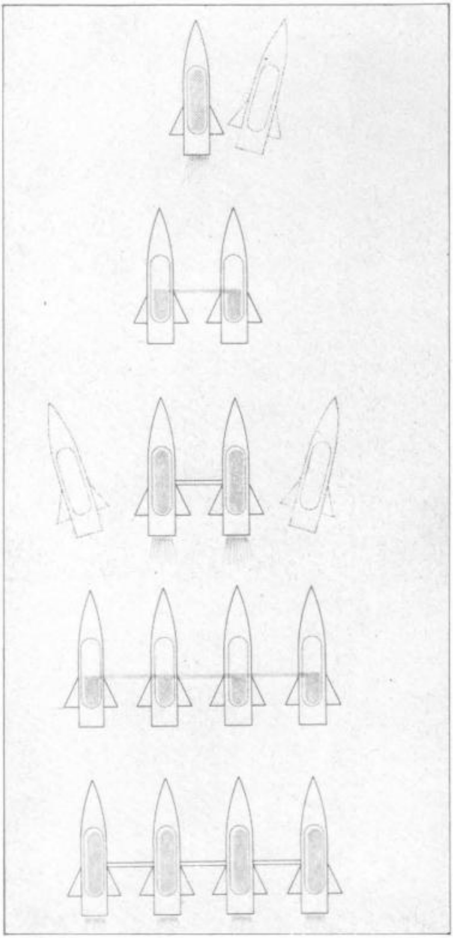

মহাশূন্যে পাঠাতে হলে রকেটের বেগ নিষ্ক্রমণের বেগের (১১·২ কিমি/সেকেন্ড) বেশি হওয়া দরকার। তরল জ্বালানি-চালিত রকেট এত জোরে ছোটাতে হলে শুধু জ্বালানির ওজনই হয়ে যাবে রকেটের ওজনের হাজার গুণ।

কম জ্বালানি ব্যবহার করে নিষ্ক্রমণবেগ অর্জন করার জন্যই বহু পর্যায়ের (multi stage) রকেটের প্রয়োজন দেখা দেয়।

বহু পর্যায় রকেটে পে লোড (শেষ পর্যন্ত যা মহাকাশে পাড়ি দেবে, মানুষ বা যন্ত্র) সমেত জ্বালানিকে পুরে দেওয়া হয় প্রথম পর্যায়ের সহায়ক রকেটের মধ্যে। সহায়ক রকেট প্রথম চালু হয় এবং মূল রকেটকে কিছুদূর অবধি টেনে নিয়ে যায়। মূল রকেট চালু হওয়ার আগেই সেটি সহায়ক রকেটের সমান বেগ অর্জন করে। সহায়ক রকেটের জ্বালানি শেষ হলে তা খসে পড়ে, চালু হয় দ্বিতীয় বা মূল রকেট। ইতিমধ্যেই জ্বালানি সমেত সহায়ক রকেটের ওজন বর্জিত হয়েছে। ফলে দ্বিতীয় রকেটটি এখন অপেক্ষাকৃত কম জ্বালানি পুড়িয়েও বেশি বেগ অর্জন করতে সক্ষম। এইভাবেই নিষ্ক্রমণবেগ অর্জনে সহায়ক হয় বহু পর্যায়ের রকেট। এতক্ষণ দু' পর্যায় বিশিষ্ট বহু পর্যায় রকেটের কথা বলা হয়েছে। তিন-চার বা পাঁচ পর্যায়বিশিষ্ট রকেটেও হয়। পর্যায় যত বাড়ে অপেক্ষাকৃত কম জ্বালানি পুড়িয়ে বেশি গতি অর্জন করা যায়। পাঁচ কিলোগ্রাম ওজনের বস্তুর পক্ষে যেখানে পাঁচ পর্যায়ের রকেটে নিষ্ক্রমণবেগ অর্জন করতে জ্বালানিসমেত রকেটের ওজন দাঁড়ায় ৩৭৫ টন, দশ পর্যায়ের রকেটে সেটি নেমে আসে ৬০ টনে।

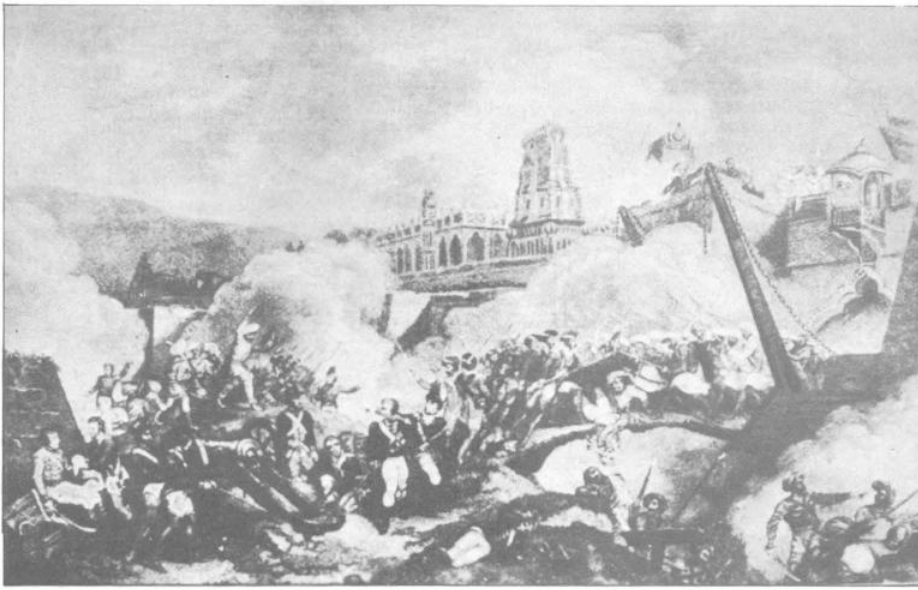

শ্রীরঙ্গপতনমের যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজদের বিরুদ্ধে টিপু সুলতানের বাহিনী

১৭৯২ ও ১৭৯৯-এ ইংরেজদের বিরুদ্ধে শ্রীরঙ্গপতনমের যুদ্ধ বিজয়ী টিপু সুলতান সমরাস্ত্র হিসেবে রকেট ব্যবহার করেন। ইংল্যান্ডের উলউইচ-এ রোটান্ডা মিউজিয়ামের সংগ্রহে এরকম দু'টি রকেট আছে। এই ভারতীয় রকেট পর্যবেক্ষণ করার পর উলউইচের বাসিন্দা উইলিয়ম কনগ্রিভ উন্নততর রকেট নির্মাণে উৎসাহী হয়েছিলেন। ১৮০৬ সাল অবধি চব্বিশ পাউন্ড ওজনের ও তিন হাজার গজ দৌড়ের উপযোগী প্রায় তেরো হাজার কনগ্রিভ রকেট তৈরি হয়েছিল।

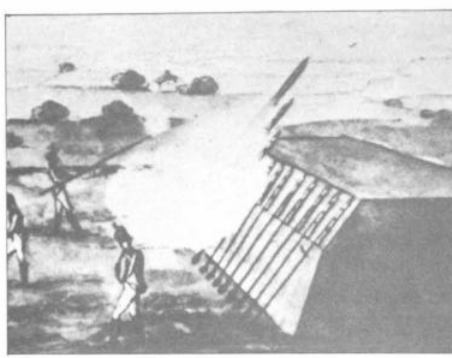

কনগ্রিভ রকেট ছোঁড়া হচ্ছে

জুলে ভার্ন-এর কল্পবিজ্ঞানের কাহিনী 'পৃথিবী থেকে চাঁদে'র মহাকাশযাত্রীরা ১৮৬৫ সালে যেখান থেকে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিল, সেই ফ্লোরিডা থেকেই ১৯৬৮-তে যাত্রা শুরু করেছিল অ্যাপোলো-৮-এর নভশ্চররা। শুধু তাই নয়, কল্পনার ও বাস্তবের দুই অভিযাত্রী-দলই পৃথিবীতে ফিরে এসে অবতরণ করেছিল সমুদ্রে। অবশ্য ভার্নের কল্পনামতো রকেটের বদলে অতিকায় কামান ছুঁড়ে মহাকাশযানকে কখনওই উৎক্ষেপণ করা সম্ভব নয়।

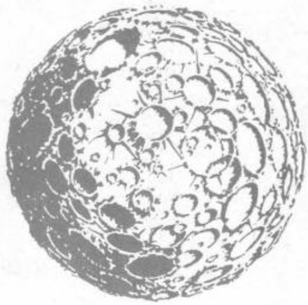

ভার্নের মহাকাশযানের অভ্যন্তর

চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগে পরিচালক ফ্রিৎজ লাং কল্পবিজ্ঞানের কাহিনী অবলম্বনে কিছু অভিনব সিনেমা তুলেছিলেন। তার মধ্যে ১৯২৮-এ 'চাঁদের পিঠে মেয়ে' সিনেমায় একটি সত্যিকার রকেট ওড়ানো হয়েছিল। সে-যুগের বিখ্যাত রকেট-বিশেষজ্ঞ হার্মান ওবার্থ ও উইলি লে-র পরামর্শ অনুসারে তৈরি এই যন্ত্রটির সঙ্গে আধুনিক রকেটের বহু সাদৃশ্য বিস্ময়কর। এই চলচ্চিত্রের দুটি ছবি মুদ্রিত হল।

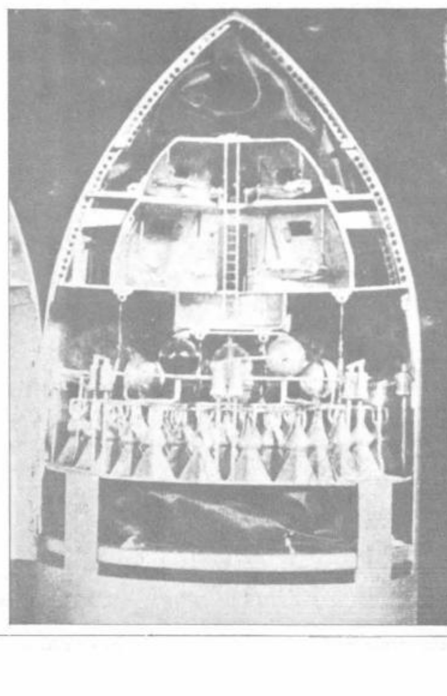

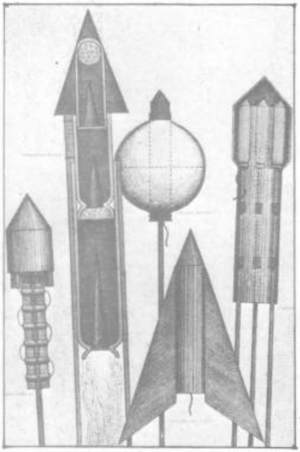

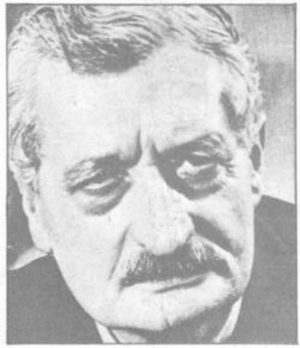

ছবিটি ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি রকেটের। বাঁ দিকে ও মাঝের রকেট দু'টি নেহাতই আতসবাজি। কিন্তু বাকি রকেটের (হাউই) মধ্যে বহু পর্যায়, পাখনা,. একত্রিত রকেট ইত্যাদি আধুনিক রকেটের নানা ব্যবহারিক সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। কেন এসব প্রয়োজন, তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা না জেনেও উদ্ভাবনগুলি হয়েছিল।

হার্মান ওবার্থ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি ব্যবহৃত V-2 রকেটের রূপকার। ১৯২৩-এ ৯২ পাতার বই 'দা রকেট ইন্টু ইন্টারপ্ল্যানেটারি স্পেস' রচনা করে তিনি পেশাদার ও অপেশাদার বহু রকেটপ্রেমীকে আকৃষ্ট করেছিলেন মহাকাশ-অভিযানের বিষয়ে।

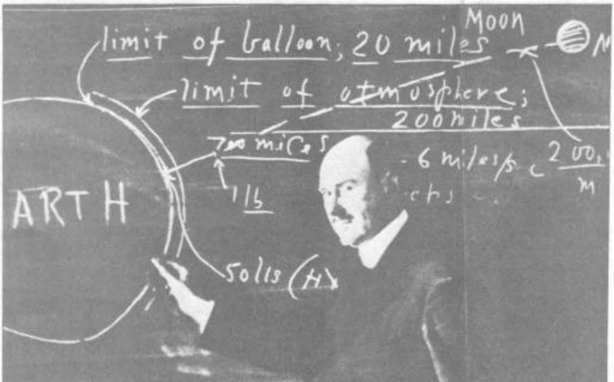

আধুনিক রকেটের জন্মদাতাদের অন্যতম রবার্ট গডার্ড। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ১৬ মার্চ, ১৯২৬ গডার্ড তাঁর প্রথম তরল জ্বালানির রকেট ছাড়ছেন। রকেটের বেগ ছিল ঘণ্টায় ৬৪ মাইল। আড়াই সেকেন্ডে এটি ১৮৪ ফুট অতিক্রম করে। ৪১ ফুট অবধি ওপরে উঠেছিল। উপরে,গডার্ড ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্ক কষে দেখাচ্ছেন নিষ্ক্রমণবেগের মান ৭ মাইল/ সেকেন্ড বা ১১·২ কিমি/সেকেন্ড।

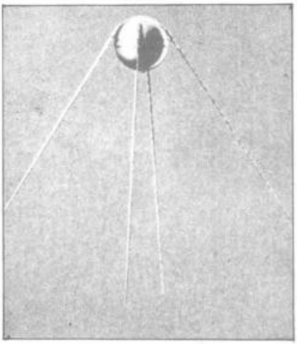

'স্পুটনিক ১'। মানুষের তৈরি এই প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ রাশিয়া কক্ষে পাঠায় ৪ অক্টোবর, ১৯৫৭। বৈকানুর কসমোড্রম থেকে গোলাকার, ৫৮ সে·মি· ব্যাস ও ৮৩·৬ কেজি ওজনের এই স্যাটেলাইট ছোঁড়া হয়েছিল। আমেরিকার প্রথম স্যাটেলাইট 'এক্সপ্লোরার-১' ছাড়া হয় ১৯৫৮-র ৩১ জানুয়ারি। নীচে, প্রথম মহাকাশযাত্রী য়ুরি গাগারিন (১৯৩৪-১৯৬৮)। ১৯৬১-র ১২ এপ্রিল সাড়ে চার টন ওজনের 'ভোস্তক-১' ব্যোমযানে চড়ে তিনি পাড়ি দেন। পৃথিবীর ১৭৫ থেকে ৩০০ কি·মি· ওপর দিয়ে ৮৯·১ মিনিটে তিনি পৃথিবীকে একবার ঘুরে আসেন। গাগারিনের চোখে চোখ রেখে মানুষ প্রথম মহাকাশের জানালা থেকে পৃথিবীকে দেখতে পায়।

য়ুরি গাগারিনই প্রথম নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করলেন যে, রকেট উৎক্ষেপণের সময় ত্বরণযুক্ত বেগের দরুন যে প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে হয়, যার ফলে মানুষের ওজন ষোলো গুণ অবধি বৃদ্ধি পেতে পারে, উপযুক্ত অনুশীলনের সাহায্যে সেই সহ্যক্ষমতা আয়ত্ত করা সম্ভব।

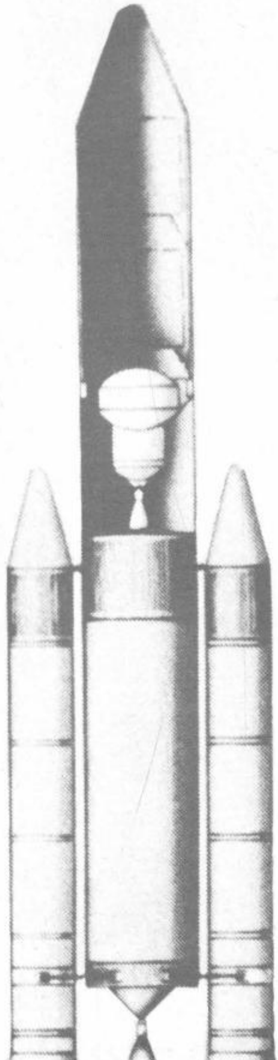

জন গ্লেন, জুনিয়ার। প্রথম মার্কিন মহাকাশচারী। ১৯৬২-র ২০ ফেব্রুয়ারি 'অ্যাটলাস' রকেটবাহিত 'মার্কারি' নামক ব্যোমযান গ্লেনকে ভূপৃষ্ঠের ১৬২ মাইল ওপরে এক কক্ষপথে নিয়ে যায়। নীচে, মহাকাশে মানুষ পাঠানোর জন্য প্রথম দুই ধরনের মার্কিন মহাকাশযান। ওপরে 'মার্কারি' ও নীচে 'জেমিনি'। 'টাইটান-২' রকেটবাহিত জেমিনি দু'জন যাত্রী নিয়ে ১৯৬৫-র ২৩ মার্চ মহাকাশে পাড়ি দেয়।

'লাইকা'। মহাকাশের প্রথম জীব এই রুশ কুকুরটি ১৯৫৭-র ৩ নভেম্বর 'স্পুটনিক-২' চড়ে যাত্রা করে। তার গায়ের সঙ্গে লাগানো যন্ত্রপাতির সাহায্যে চার দিন ধরে লাইকা মহাকাশে জীবন্ত প্রাণীর অবস্থা সম্বন্ধে বেতারে নানা তথ্য পাঠায়।

রুশ মহাকাশচারী টিটভ। 'ভোস্তক-২' চড়ে ১৯৬১-র ৬ অগস্ট যাত্রা করেন। তিনি প্রথম মহাশূন্য থেকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পৃথিবী পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু করেন। ২৫ ঘণ্টা ১১ মিনিট ব্যাপী পরিক্রমার কালে তিনি পৃথিবীর পরিবেশ ও জলসম্পদ সম্বন্ধে ছবি তুলে পাঠান। টিটভের মহাকাশ অভিযানের সময় ভোস্তক-২-এর চলার পথ পৃথিবীর নিজস্ব কক্ষপথে ভ্রমণের সঙ্গে-সঙ্গেই পরিবর্তিত হয়। ছবিটিতে তাই দেখানো হয়েছে। ১৭ বার পৃথিবী পরিক্রমার দরুন টিটভ পৃথিবীর চারিদিকে ৪৩৫,০০০ মাইল ঘোরেন, আবার পৃথিবী তার সূর্যকেন্দ্রিক কক্ষপথে টিটভকে টেনে নিয়ে যায় ১৭ লক্ষ মাইল।

পৃথিবীর প্রথম মহিলা মহাকাশযাত্রী রাশিয়ার ভ্যালেনটিনা তেরেশকোভা। ১৯৬৩-র ১৬ জুন তিনি মহাকাশে পাড়ি দেন। 'ভোস্তক-৬' মহাকাশযানে দু'দিন ২২ ঘণ্টা ৫০ মিনিট কাটিয়েছিলেন। পৃথিবীতে ৮১ বার পরিক্রমা করেন। ছবিতে মহাকাশযাত্রার আগে তাঁকে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

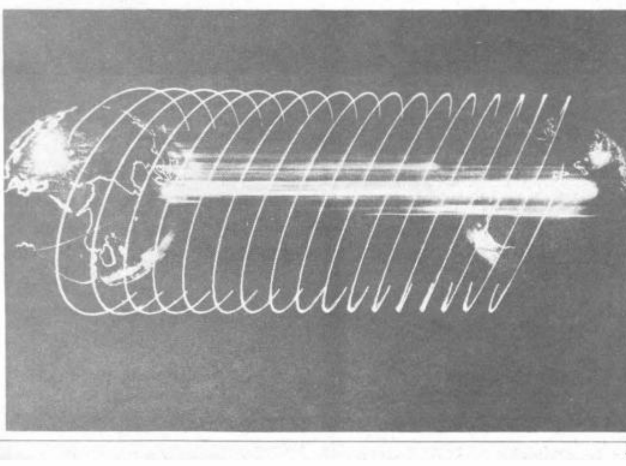

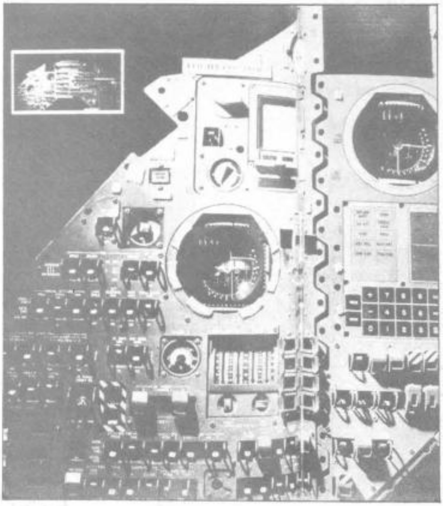

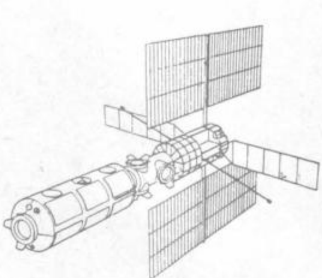

মহাকাশযানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা বেতারব্যবস্থা ইত্যাদি চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করা হয় সৌরশক্তি থেকে। 'ফোটোভোল্টায়িক সেল' বা সংক্ষেপে 'ফোটো-সেল' সূর্যালোককে সরাসরি রূপান্তরিত করে বিদ্যুতে। এই বিদ্যুৎ মহাকাশযানের ব্যাটারিকে উজ্জীবিত রাখে।

নীচের ছবিতে স্কাইল্যাব 'স্পেস স্টেশন'-এর ১৪৭, ৮৪০টি সোলার সেল বিশিষ্ট একটি ডানা। ২১৯ বর্গমিটারের এক-একটি ডানা ১০,৫০০ ওয়াট উৎপন্ন করে।

জটিল প্রযুক্তিবিদ্যার নানা শাখার সার্থক সমন্বয়ের পরিণতি একটি মহাকাশযান। ছবিতে 'অ্যাপোলো' শ্রেণীর মহাকাশযানের 'কন্ট্রোল-প্যানেল'।

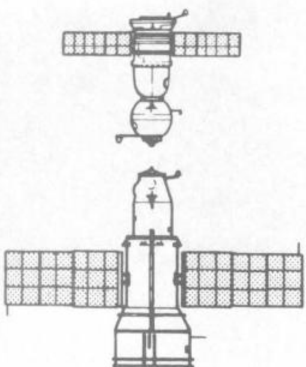

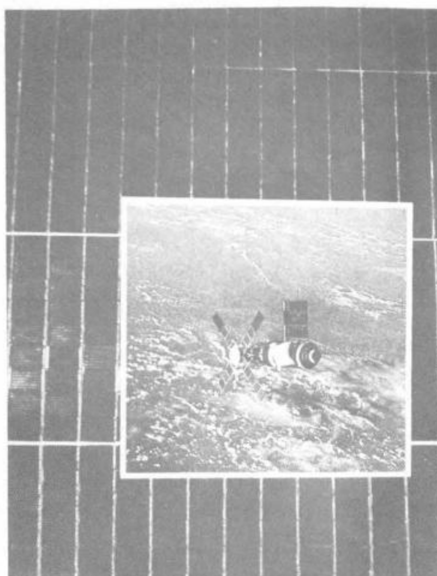

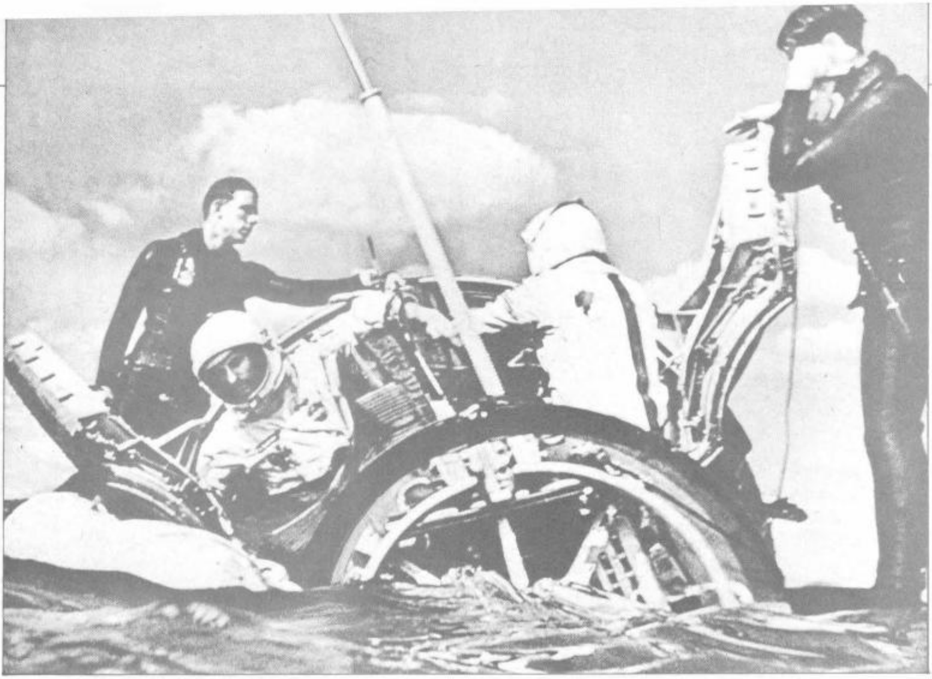

মহাকাশযান অবতরণের সময় সাহায্য নেওয়া হয় গতিমন্দনকারী 'রেট্রো' রকেটের। ফেরার সময় মহাকাশযানের যে প্রান্তে তাপ-আবরণ আছে সেই প্রান্ত সোজাসুজি বায়ুমণ্ডলের দিকে রাখা দরকার, যাতে মহাকাশযান ভস্মীভূত না হয়ে যায়।

অবতরণের প্রথম পর্বে আসে 'ড্রপ প্যারাসুট' উন্মোচন। ৭০,০০০ ফুট ওপরে থাকতেই এটির সাহায্যে মহাকাশযানের গতি কমিয়ে আনা হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১২,০০০ ফুট ওপরে থাকতে মূল প্যারাসুটের যন্ত্রপাতি কাজ শুরু করে ও মহাকাশযানটি ভাসতে ভাসতে ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছয় (সাধারণত সমুদ্রে)। নিখুঁত যোগাযোগ-ব্যবস্থার ফলে মহাকাশযান কোথায় পড়বে আগেই জানা থাকে—জাহাজ ও হেলিকপ্টার মহাকাশচারী ও মহাকাশযান উদ্ধার করে। ছবিতে ভাসমান অবস্থায় মহাকাশচারী টমাস স্ট্যাফোর্ড ও ওয়াল্টার শিরা। রক্ষাকারী জাহাজ থেকে ১৪ মাইল দূরে 'জেমিনি-৬' মহাকাশযানসহ সমুদ্রে অবতরণ করেন তাঁরা। ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৫।

বৈকানুর কসমোড্রম। রাশিয়ার মহাকাশযান উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র। 'ভোস্তক', 'ভোস্‌খদ', 'সয়ুজ' ও 'সালিয়ুত' শ্রেণীর বহু ব্যোমযান ছাড়া হয়েছে এখান থেকে

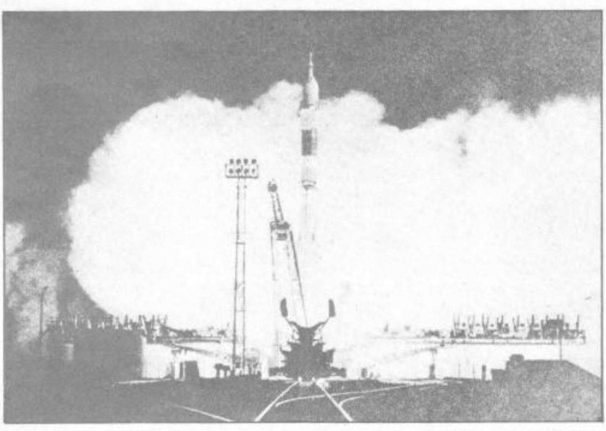

রুশ অভিযাত্রী আলেক্সি লিওনভ। মহাকাশে প্রথম হাঁটেন তিনি। ১৯৬৫-র ১৮ মার্চ ১০ মিনিট মহাশূন্যে কাটান। এই ঘটনাকে চাঁদে মানুষের পদক্ষেপের সবুজ সংকেত বলা যেতে পারে।

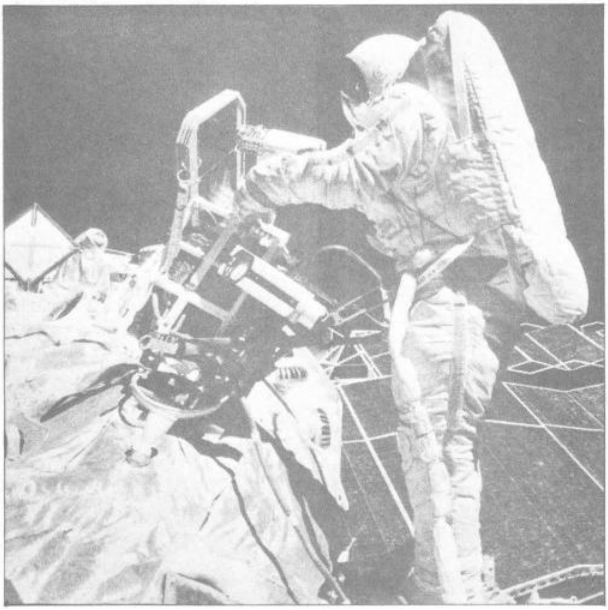

মহাকাশে দ্বিতীয় নারী শ্বেতলানা সাভিৎস্কায়া। 'সয়ুজ টি-৭' মহাকাশযানে ১৯৮২ সালের ১৯ অগস্ট মহাকাশে যান, সঙ্গে ছিলেন দু'জন সহযোগী। মহাকাশে কাটান ৭ দিন, ২১ ঘণ্টা ৫২ মিনিট। ১৯৮৪ সালে শ্বেতলানা সয়ুজ টি-১২ মহাকাশযানে চড়ে পাড়ি দেন। মিলিত হন 'সালিয়ুৎ-৭' স্পেস স্টেশনের সঙ্গে। ফিরে আসেন ১৯৮৪-র ২৯ জুলাই। এরই মধ্যে শ্বেতলানা মহাকাশে হাঁটেন, 'ওয়েল্ডিং' করেন। ছবিতে শ্বেতলানা মহাকাশযানের বাইরে।

নীচে, সয়ুজ ১-এর যাত্রী ভ্লাদিমির কোমারভ। ১৯৬৭-তে ১৮বার পৃথিবী পরিক্রমার পরে যান্ত্রিক গোলযোগের দরুন মহাকাশযানটি মাটিতে পড়ে চূর্ণ হয়ে যায়। মহাকাশের প্রথম শহিদ।

অক্টোবর ১১ – ১৩, ১৯৬৯। তিনটি মহাকাশযানের সয়ুজ ৬, ৭, ৮-এর মোট সাতজন মহাকাশচারী ৭৫ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন ১১৮$\frac{১}{২}$ ঘণ্টা ধরে। ছবিতে পৃথিবীতে ফেরার পরে সাত নভশ্চর।

চাঁদে হানা

মানুষের তৈরি মহাকাশযান চাঁদে গিয়ে হানা দিল ১৯৫৯-এ। রাশিয়ার 'লুনিক-১' আছড়ে পড়ল চাঁদের ওপর। এক মাসের মধ্যে 'লুনিক-৩' চাঁদের বিপরীত পিঠের ছবি তুলে পাঠাল। এই দৃশ্য পৃথিবীতে বসে কখনও দেখা সম্ভব নয়। মার্কিন চন্দ্র-অভিযানের সূচনা করল ১৯৬৪তে 'রেঞ্জার-৭' মহাকাশযান। শুরু হল রাশিয়া আর আমেরিকার মধ্যে অভিনব বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক প্রতিযোগিতা। অনেক 'প্রথম' ঘটনার গৌরব রাশিয়ার প্রাপ্য। 'লুনা-৯' ধীর অবতরণ করে ফোটো তুলল (১৯৬৬), চন্দ্র পরিক্রমা করল 'লুনা-১০' (১৯৬৬), আর 'জোন্দ-৫' কক্ষপথে চন্দ্র পরিক্রমার পর পরীক্ষার ফলসহ ফিরে এল পৃথিবীতে (১৯৬৭)। এ ছাড়াও ১৯৬০ থেকে রাশিয়ার লুনা শ্রেণীভুক্ত ১২, ১৩, ১৬, ১৭, ১৯, ২০ ও ২১ সংখ্যক মহাকাশযান ও লুনার অরবিটার ১, ২ ও ৩ ক্রমাগত চন্দ্র-অভিযানে নিযুক্ত হয়েছে।

আমেরিকা ১৯৬৪-'৬৫তে রেঞ্জার ৭, ৮ ও ৯, পরবর্তী দু'বছরে সার্ভেয়ার ১, ৩, ৫, ৬ ও ৭ এবং 'এক্সপ্লোরার-৩৫' নামে বিভিন্ন মহাকাশযান মারফত চাঁদে মানুষ পাঠাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। ১৯৬৮-র ২১ ডিসেম্বর 'অ্যাপোলো-৮' তিন নভশ্চর, ফ্র্যাঙ্ক বোরম্যান, জেমস এ· লোভেল ও উইলিয়ম এ অ্যানডার্সকে নিয়ে পাড়ি দিল। মাত্র ১১২ কিলোমিটার দূর থেকে চন্দ্র পরিক্রমা করে ফিরে এলেন তাঁরা। ১৯৬৯-এ 'অ্যাপোলো-১০'-এর আরোহী স্ট্যাফর্ড, ইয়ং ও সেরনান চাঁদের পিঠের পনেরো কিলোমিটারের মধ্যে উপস্থিত হলেন। ২১ জুলাই ১৯৬৯—নিল এ· আর্মস্ট্রং ও এডউইন অ্যালড্রিন-এর চান্দ্রযান এসে নামল চাঁদের 'প্রশান্ত সাগর' এলাকায়। কয়েক ঘণ্টা পরে চাঁদের মাটিতে মানুষ প্রথম পা ফেলল। বাইশ ঘণ্টা চাঁদে কাটিয়ে ২২ কেজি পাথর সংগ্রহ ও নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করেন তাঁরা। 'অ্যাপোলো-১২' (১৯৬৯), 'অ্যাপোলো-১৪' (১৯৭১), 'অ্যাপোলো-১৫' (১৯৭১), 'অ্যাপোলো-১৬' ও 'অ্যাপোলো-১৭' (১৯৭২) চড়ে আরও দশজন অভিযাত্রী চাঁদে অবতরণ করেছেন। যথাক্রমে কনরাড ও বিন, শেপার্ড ও মিচেল, স্কট ও আরউইন, ইয়ং ও ডিউক, সেরনান ও শ্মিট।

রাশিয়া চাঁদে মানুষ পাঠায়নি, কিন্তু ১৯৭০-এ 'লুনা-১৬' চাঁদের 'উর্বর সাগর' এলাকায় নেমে দূর নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় চাঁদের পাথর সংগ্রহ করে পৃথিবীতে ফিরে আসে। এই বছরেই 'লুনা-১৭' চাঁদের 'বর্ষণ সাগরে' স্বয়ংচালিত চান্দ্রযান 'লুনোখোদ-১' নামিয়ে দেয়। এক মাসে লুনোখোদ ১০, ৪৫০ মিটার চষে বেড়ায়। 'লুনা-১৯' (১৯৭১) ও 'লুনা-২০' (১৯৭২) চাঁদ সম্বন্ধে সংগ্রহ করে আরও তথ্য। ১৯৭৩-এ 'লুনা-২১' চাঁদের পিঠে স্বয়ংক্রিয় স্টেশন ও দ্বিতীয় চান্দ্রযান 'লুনোখোদ-২' স্থাপন করে। রুশ অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয় চাঁদে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালানোর জন্য মানুষ পাঠানো বাধ্যতামূলক নয়।

রুশ ও মার্কিন অভিযানের পর এখন আমরা নিশ্চিত যে, চাঁদে কোনও প্রকারের জীবন নেই, কোনও দিনই সম্ভবত ছিল না। মধ্যদিনের উত্তাপ সেখানে স্ফুটনাঙ্কের দেড়শো ডিগ্রি ওপরে, আর মধ্যরাতে হিমাঙ্কের দেড়শো ডিগ্রি নীচে। চাঁদের এক-একটি দিন বা রাতের মেয়াদ পৃথিবীর হিসেবে দু'সপ্তাহ করে।

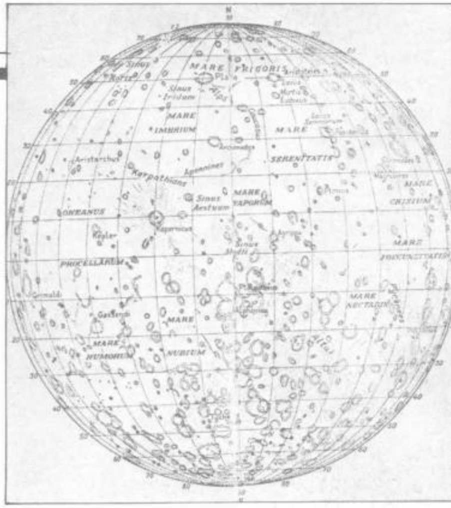

পৃথিবী থেকে দৃশ্যগোচর চাঁদের পিঠের মানচিত্র

'লুনিক-৩'। চাঁদের অ-দেখা পিঠের প্রথম ফোটো তোলে

চাঁদের অ-দেখা পিঠের মানচিত্র

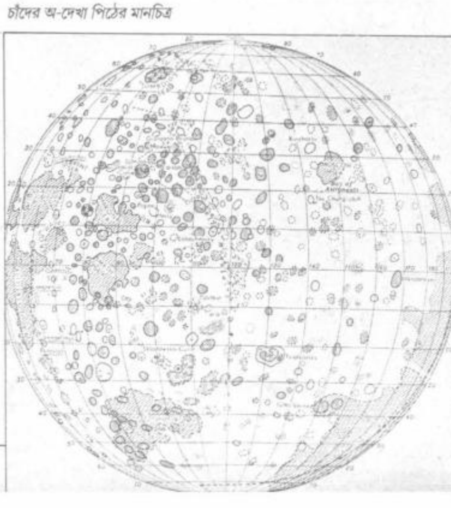

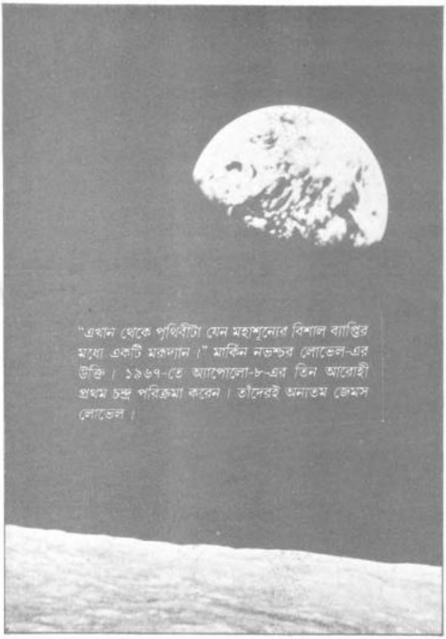

"এখান থেকে পৃথিবীটা যেন মহাশূন্যের বিশাল ব্যাপ্তির মধ্যে একটি মরূদ্যান।" মার্কিন নভশ্চর লোভেল-এর উক্তি। ১৯৬৭-তে অ্যাপোলো-৮-এর তিন আরোহী প্রথম চন্দ্র পরিক্রমা করেন। তাঁদেরই অন্যতম জেমস লোভেল।

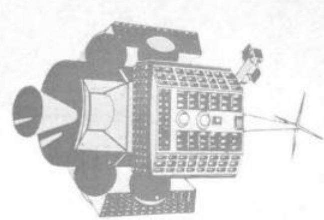

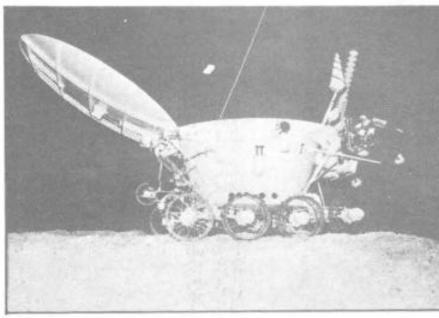

চাঁদের দেশে লুনোখোদ। মনুষ্যহীন স্বয়ংচালিত যান

১৯৭০-এ রুশ মহাকাশযান 'জোন্দ-৮' গৃহীত চাঁদের বহু ছবির অন্যতম, 'অ্যাপোলো-১১'র চন্দ্রযাত্রার আগে এই ছবিগুলি প্রস্তুতিমূলক মহড়ার কাজে সহায়ক হয়েছিল

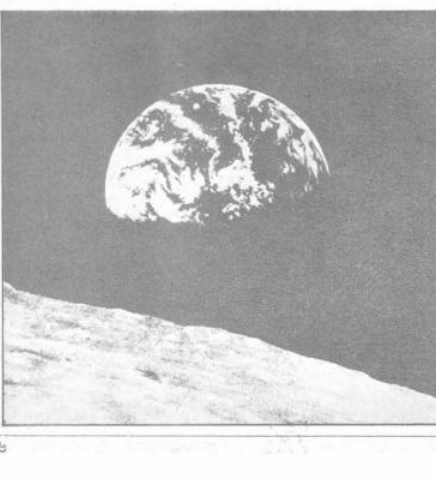

ওপরে, আর্মস্ট্রং চাঁদে পায়চারি করছেন । চান্দ্রযান 'ঈগল'কেও দেখা যাচ্ছে । চান্দ্রযান ছেড়ে ২০০ ফুটের মতো দূরে গিয়েছিলেন তিনি ।

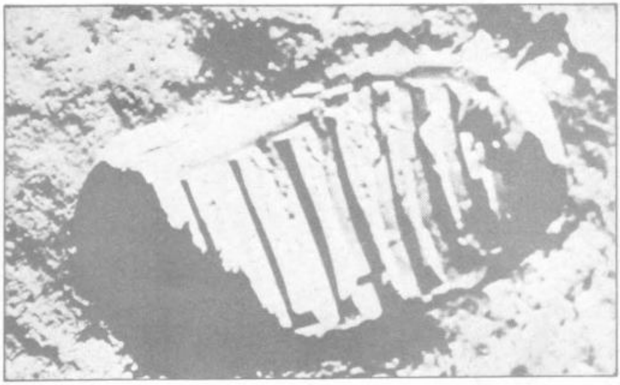

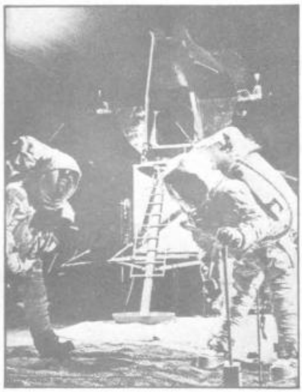

ওপরে, চাঁদের মাটিতে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ । বাঁ দিকে, আর্মস্ট্রং ও আলড্রিন চাঁদের মাটি ও পাথর সংগ্রহের জন্য প্রশিক্ষণরত ।
নীচে, 'অ্যাপোলো-১১'র তিন যাত্রী । আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিন্স ও আলড্রিন ।

নীচে, আর্মস্ট্রংয়ের তোলা দ্বিতীয় চন্দ্রযাত্রী আলড্রিন । এঁরা দু'জনে মিলে চাঁদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা উত্তোলন করেন ।

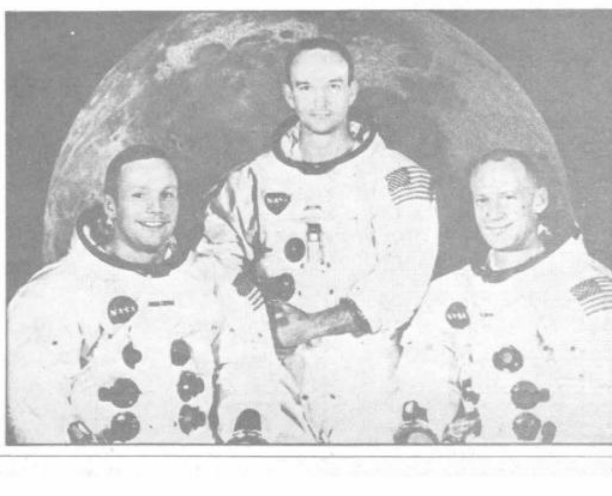

অ্যাপোলো মহাকাশযান

নীচে বাঁ দিকে, ৩৬৫ ফুট উঁচু অতিকায় 'স্যাটার্ন-৫' রকেট। 'অ্যাপোলো ১১' নামে যে মহাকাশযানে চড়ে মানুষ প্রথম চাঁদে পদার্পণ করে সেটিকে পৃথিবী থেকে মহাকাশে নিয়ে গিয়েছিল এই রকেট। নীচে ডান দিকে, মহাকাশযানের তিনটি অংশ বা 'মডিউল'। এর মধ্যে শুধু একটি মডিউল ফিরে আসে পৃথিবীতে। অভিযাত্রীদের চাঁদে নামিয়ে দেওয়ার পর লুনার মডিউলের 'ডিসেন্ট স্টেজ'টির কাজ ফুরোয়। 'অ্যাসেন্ট' স্টেজ'-এ চড়ে অভিযাত্রীরা চাঁদ পরিক্রমারত কম্যান্ড মডিউল ফিরে আসার পর এই স্টেজটিও পরিত্যক্ত হয়। ফিরতি পথে যাত্রিবাহী কম্যান্ড মডিউল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পূর্বমুহূর্তে 'সার্ভিস মডিউল'কেও ত্যাগ করা হয়।

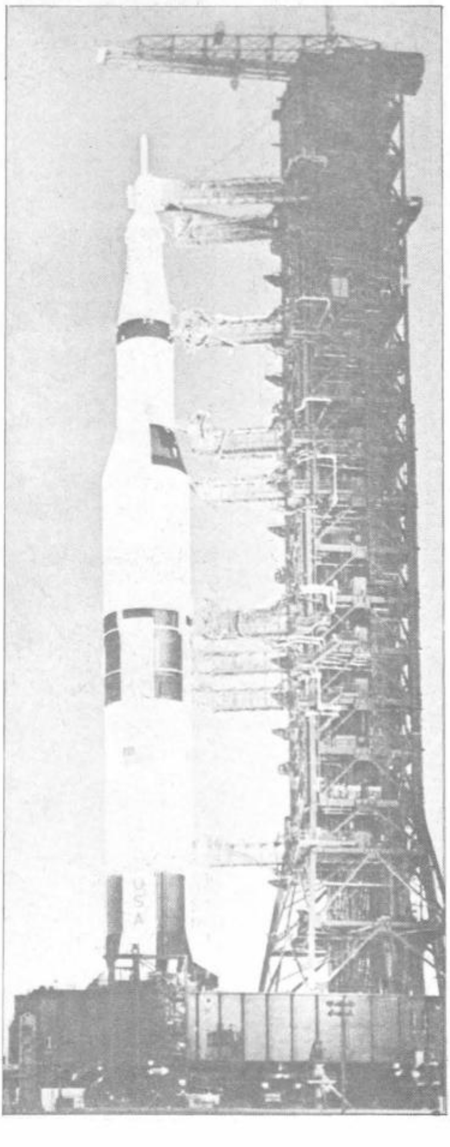

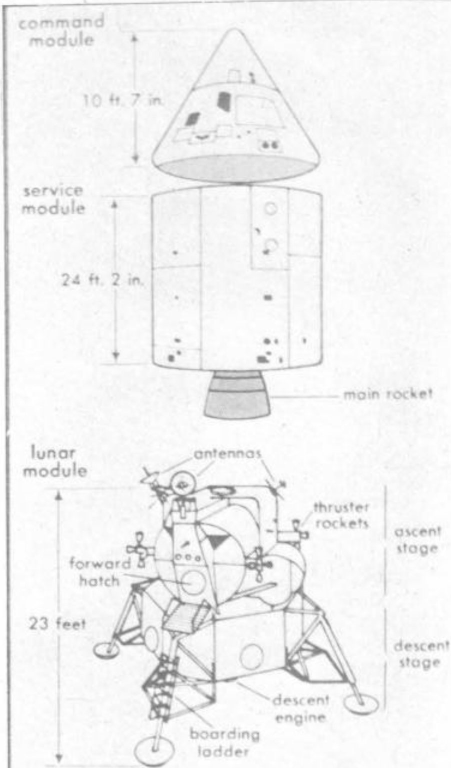

রকেটের তৃতীয় পর্যায় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর সার্ভিস ও কম্যান্ড মডিউল সংযুক্ত অবস্থায় মুখ ঘুরিয়ে লুনার মডিউলের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং সংযুক্ত মডিউল তিনটি চাঁদে পাড়ি দেয়।

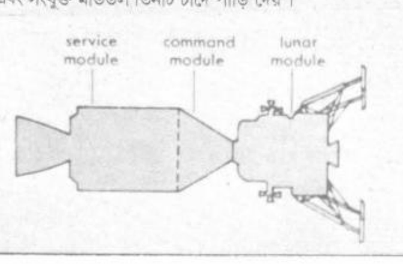

অ্যাপোলো ১১-র চাঁদে পাড়ি

(১) দশ, নয়, আট····দুই, এক, শূন্য। কাউন্ট ডাউন শেষ হওয়া মাত্র 'স্যাটার্ন-৫' রকেটের প্রথম পর্যায় ঝলসে ওঠে। আড়াই মিনিট জ্বলার পর এই পর্যায় খসে পড়ে।
(২) নীচে, দ্বিতীয় স্টেজটি ৬½ মিনিট জ্বলার পর অ্যাপোলোকে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করে।

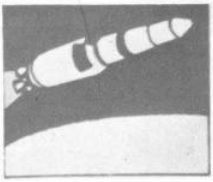

(৩) দু'বার পৃথিবী পরিক্রমার পর রকেট তার তৃতীয় পর্যায়ের শক্তির সাহায্যে অ্যাপোলোকে পাঠিয়ে দেয় চাঁদের দিকে।

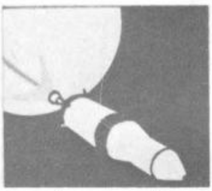

(৪) সার্ভিস ও কম্যান্ড মডিউল মুখ ঘুরিয়ে লুনার মডিউলের সঙ্গে যুক্ত হয়।

(৫) কম্যান্ড মডিউল তার নিজস্ব রকেট-এঞ্জিন ছুঁড়ে অ্যাপোলোর গতি কমিয়ে তাকে চন্দ্র পরিক্রমায় নিযুক্ত করে।

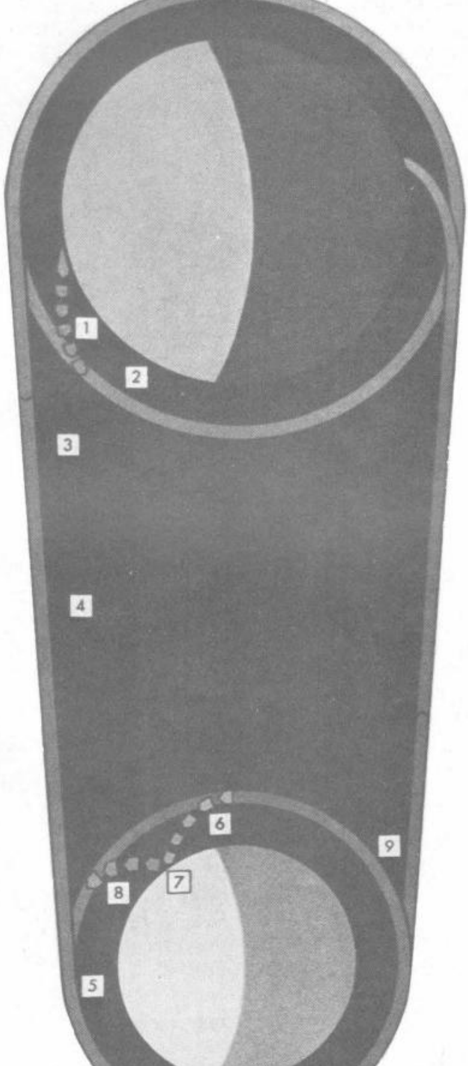

(৬) লুনার মডিউল বিচ্ছিন্ন হয়ে দু'জন নভশ্চর সমেত চাঁদের পিঠে এসে নামে।

(৭) অভিযাত্রীরা চাঁদের পাথরের নমুনা সংগ্রহ করেন, নানা পরীক্ষা চালান, ফোটো তোলেন।

(৮) লুনার মডিউল নিজস্ব রকেট এঞ্জিন ছুঁড়ে চাঁদ থেকে অভিযাত্রীদের ফিরিয়ে আনে কম্যান্ড-সার্ভিস মডিউলে।

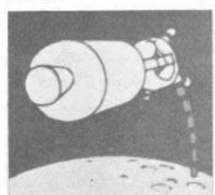

(৯) সার্ভিস মডিউলের নিজস্ব রকেট চালু হলে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের যাত্রা শুরু হয় অ্যাপোলোর।

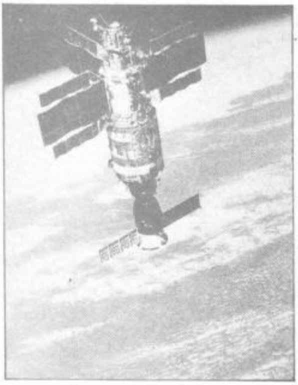

মহাশূন্যে দু'টি মহাকাশযানের মিলন 'ডকিং' নামে পরিচিত। প্রথম ডকিং হয় ১৯৬৯-এর ১৫-১৬ জানুয়ারি। 'সয়ুজ-৪' ও 'সয়ুজ-৫'-এর ডকিংয়ের পর মহাকাশচারীরা এক মহাকাশযান থেকে অপরটিতে চলাচল করেন। ওপরের ছবিতে ১৯৮৫-র ৬ জুন স্পেস-স্টেশন 'সালিয়ুৎ-৭'-এর সঙ্গে 'সয়ুজ টি-১৩'-র ডকিং দেখা যাচ্ছে।

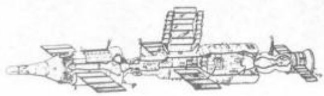

১৯৭১-এ রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে মহাকাশ-গবেষণায় সহযোগিতার জন্য একটি চুক্তি হয় (১৯৮২-র মে মাসে চুক্তি বাতিল হয়ে গেছে)। এই চুক্তির ফলে ১৯৭৫-এ হল্যান্ডের ওপরে রাশিয়ার 'সয়ুজ-১৯' ও আমেরিকার 'অ্যাপোলো-১৮'-র ডকিং হয়। দু'ই রুশ ও তিন মার্কিন নভশ্চরের করমর্দন টিভিতে দেখেন পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ। নীচে, ভূপৃষ্ঠের ১৬৮ মাইল ওপরে এই মিলনের ছবি।

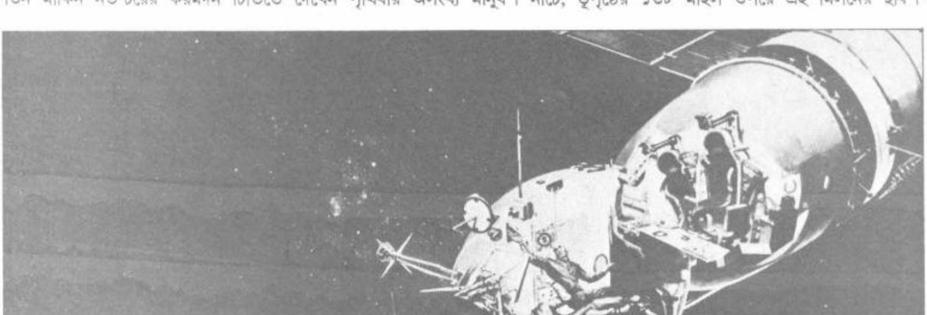

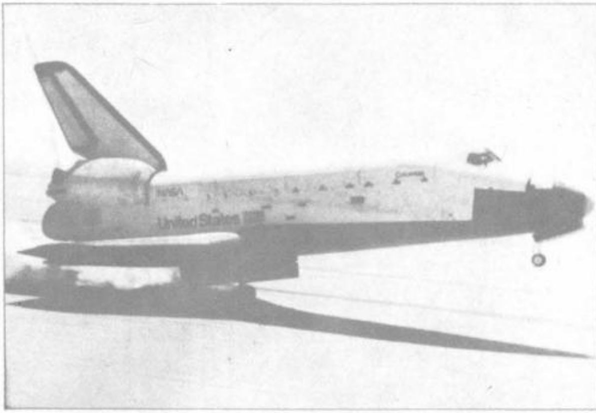

কলম্বিয়ার যাত্রা শুরু

ভূপৃষ্ঠ ও মহাকাশের মধ্যে বারবার চলাচলের উপযোগী মহাকাশযান 'স্পেস-শাট্‌ল' বা খেয়া ব্যোমযান'। স্পেস শাট্‌ল মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার খরচ কমিয়ে দিয়েছে। কারণ সাধারণ রকেটবাহী মহাকাশযান একবারই ব্যবহার করা যায়। শাট্‌ল উৎক্ষিপ্ত হয় রকেটের মতো, কিন্তু অবতরণ করে এরোপ্লেনের ভঙ্গিতে।

১৯৮১-র ১২ এপ্রিল প্রথম স্পেস-শাট্‌ল ('ও ভি ১০২-কলম্বিয়া') কেনেডি স্পেস-সেন্টার থেকে দুই নভশ্চরকে নিয়ে যাত্রা করে। ৫৪ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পরে সেটি ক্যালিফোর্নিয়ার এডওয়ার্ডস বিমানবন্দরে ৩৪৪ কি মি/ ঘণ্টা বেগে অবতরণ করে।

স্পেস-শাট্‌লের প্রধান অংশ

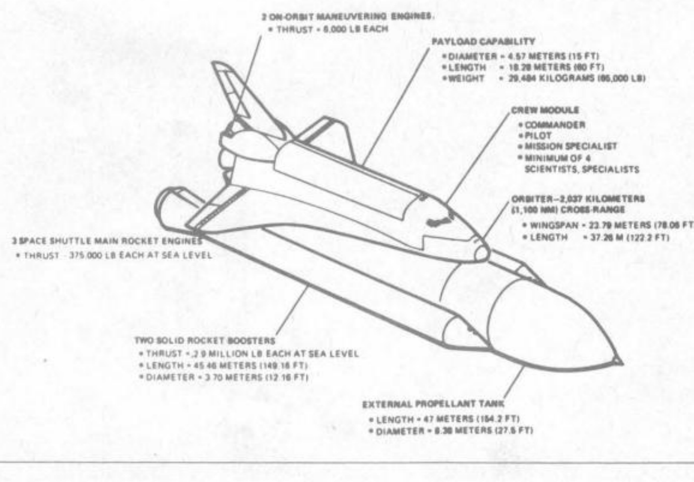

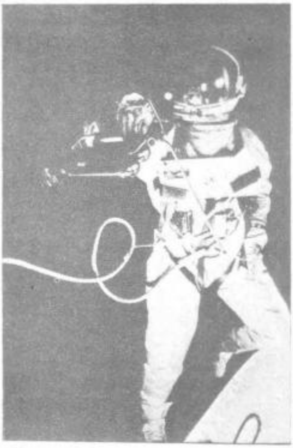

মহাকাশে গ্যাসচালিত মোটর হাতে নভশ্চর

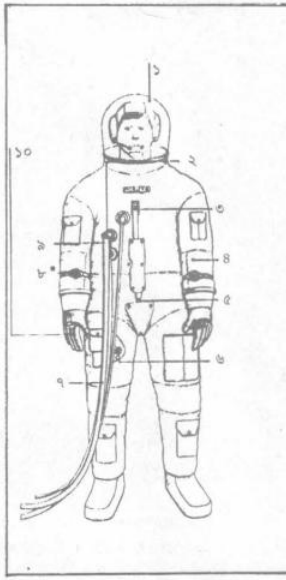

স্পেসস্যুট

১—বিশেষ পলিকার্বনেট নির্মিত হেলমেট
২—অক্সিজেন প্রবেশদ্বার
৩—H_2O কানেকটর
৪—চাপ লাঘবের চাবি
৫—বাইরের জিপার
৬— মূত্র সংগ্রহ ও নিকাশের অংশ
৭—নভোযানের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী নল
৮—চাপমান যন্ত্র
৯—অক্সিজেন নির্গম দ্বার
১০—প্রেশার দস্তানা

মানুষের দিনে ৮০০ গ্রাম অক্সিজেন প্রয়োজন। নভোযানের কেবিনে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড থেকে নিঃসৃত হয় অক্সিজেন। একই সঙ্গে এই দ্রব্যটি কার্বন ডাই ও মোনোঅক্সাইড গ্যাস বিশ্লেষণ ও পরিশোধন করে।

নভশ্চররা পলিথিনের ব্যাগে চাপ দিয়ে তার থেকে দীর্ঘকাল ব্যবহারের উপযোগী সিলভার-আয়ন মেশানো জল খান। কারণ, মহাকাশে ওজনশূন্য অবস্থায় খোলা পাত্র থেকে জল উপচে পড়ে ক্ষুদ্র বিন্দুর আকারে যত্রতত্র ভেসে যায়।

বায়ুহীন উন্মুক্ত মহাকাশে বা চাঁদে বিচরণের সময় অপরিহার্য বায়ুনিরোধক হেলমেটসমেত স্পেসস্যুট। নভোযানের কেবিনেও বায়ুর চাপ কমে গেলে এই পোশাক আরোহীর প্রাণরক্ষা করতে পারে। স্পেসস্যুট একাধিক পোশাকের সমন্বয়ে তৈরি। ওপরের সাদা আচ্ছাদনের নীচে স্ক্রিন-ভ্যাকুয়াম তাপ-আস্তরণ আর তার নীচে বহুস্তরের বায়ু নিরোধক আবরণ। নভশ্চরের পিঠে হ্যাভারস্যাকে থাকে অক্সিজেন ও বায়ু-পরিশোধন ব্যবস্থা। একটি নল থলিটিকে যুক্ত রাখে স্পেসস্যুটের সঙ্গে। নভোযানের সঙ্গে, শুধু যোগাযোগ রক্ষাকারী তার ও সেফটি-বেল্ট যুক্ত অবস্থায় নভশ্চর মহাকাশে চলাফেরার জন্য ব্যবহার করেন রি-অ্যাকটিভ মোটর বা মুঠোর মধ্যে ধরা পিস্তলের আকৃতির গ্যাসচালিত মোটর।

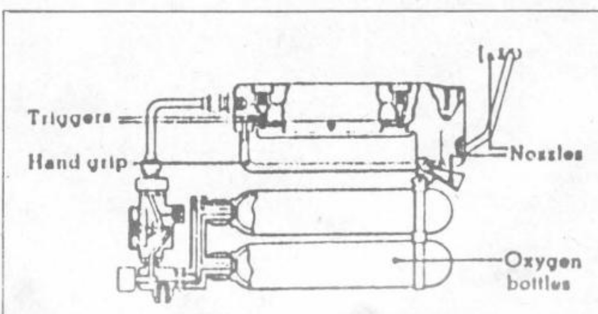

মহাকাশে চলাফেরার জন্য হাতে ধরার উপযোগী গ্যাসচালিত মোটর

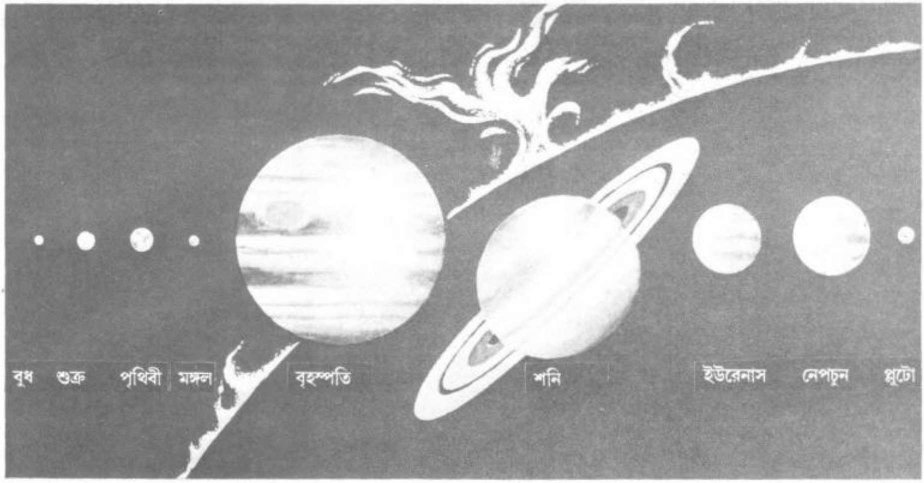

চাঁদ পেরিয়ে গ্রহলোকে আমাদের যাত্রা শুরু ১৯৬০-এ। মানুষের তৈরি দ্রুততম যান রকেটও মহাশূন্যের ব্যাপ্তিতে নেহাতই মন্থর। সৌরমণ্ডল পেরিয়ে নিকটতম তারার কাছে পৌঁছতে তার আশি হাজার বছর কেটে যাবে। ওপরের ছবি গ্রহদের তুলনামূলক আয়তনের হদিস দিচ্ছে। আর নীচের তালিকা দিচ্ছে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য। গ্রহান্তরে প্রেরিত মহাকাশযান থেকে পেয়েছি, পেয়ে চলেছি নতুন নতুন তথ্য। বহু পুরনো হিসেবেরও ভুল ধরা পড়ছে।

	সূর্য থেকে গড় দূরত্ব (লক্ষ কি·মি·)	কক্ষ-আবর্তন সূর্যকে কত দিনে এক পাক খায়	নিরক্ষরেখার ব্যাস (কি·মি·)	অক্ষ-আবর্তন কত ঘণ্টা/দিনে অক্ষে এক পাক খায়	ভর (কে· জি·)	ঘনত্ব (জল=১)
সূর্য	—	—	1392530	24.6 দিন	1.9891×10^{30}	1.41
চাঁদ	—	27.322	3476	27.32 দিন	7.3483×10^{27}	3.34
বুধ	579.1	87.969	4878	58.65 দিন	3.3022×10^{23}	5.43
শুক্র	1082.1	224.701	12104	243 দিন	4.8689×10^{24}	5.24
পৃথিবী	1496.0	365.256	12756	23.93 ঘণ্টা	5.9742×10^{24}	5.52
মঙ্গল	2279.4	686.980	6794	24.62 ঘণ্টা	6.4191×10^{23}	3.94
বৃহস্পতি	7783.4	4332.59	142800	9.8 ঘণ্টা	1.899×10^{27}	1.32
শনি	14270.0	10759.20	120000	10.2 ঘণ্টা	5.684×10^{26}	0.70
ইউরেনাস	28696.0	30684.8	51800	16.3 ঘণ্টা	8.6978×10^{25}	1.27
নেপচুন	44966.0	60190.5	49500	18.2 ঘণ্টা	1.028×10^{26}	1.77
প্লুটো	59000.0	90465.0	2500(?)	6.3 দিন	1.6×10^{22}	1.2

উপগ্রহের তালিকা : পৃথিবী : চাঁদ ॥ মঙ্গল : ডাইমস, ফোবোস ॥ বৃহস্পতি : মেটিস, অ্যাড্রাস্টিয়া, অ্যামিথিয়া, 1979J2, আইও, ইউরোপা, গানিমিড, ক্যালিস্টো, লেডা, হিমালিয়া, লাইসিথিয়া, ইলারা, আনাংকে, কার্মে, পাসিফি, সিনোপি ॥ শনি : 1980 S 28, 1980 S 27, 1980 S 26, 1980 S1 S3, মিমাস, এনকেলেডাস, টেথিস, 1980 S 25 S 13, ডায়োনি, 1980 S6, রিয়া, টিটান, হাইপারিওন, ইয়াপেটাস, ফোবে ॥ ইউরেনাস : মিরাণ্ডা, এরিয়েল, আমব্রিয়েল ॥ নেপচুন : ট্রিটন, নেরেইড ॥ প্লুটো : শ্যারন, টিটানিয়া, ওবেরন ॥

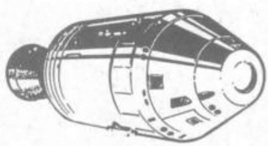

শুক্রের উদ্দেশে আমেরিকার 'পায়োনিয়র-৫' রওনা হয় ১৯৬০-র ১১ মার্চ। পরের বছর, ১২ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া ছাড়ে 'ভেনেরা-১'। শুক্রের প্রায় এক লক্ষ কি·মি· দূর দিয়ে চলে যায় সেটি। ১৯৬৪ ও ১৯৬৫-তে রাশিয়া 'জোন্দ-১', 'জোন্দ-২' ও 'জোন্দ-৩' পাঠায় যথাক্রমে শুক্র, মঙ্গল ও চাঁদের উদ্দেশে। আমেরিকার 'মার্স-১', 'মেরিনার-৩' ও 'মেরিনার-৪' যাত্রা করে মঙ্গলের দিকে । 'মেরিনার-৪' মঙ্গলের দশ হাজার কিলোমিটারের মধ্যে গিয়ে আলোকচিত্র পাঠায়।

রাশিয়া ইতিমধ্যে শুক্রে অবতরণের চেষ্টা চালাতে থাকে। 'ভেনেরা-২' শুক্রের ২৬ হাজার কিলোমিটার দূর দিয়ে চলে যায়, 'ভেনেরা-৩' শুক্রের পিঠে আছড়ে পড়ে। 'ভেনেরা-৪' শুক্রে ধীর অবতরণ করে। 'ভেনেরা-৫' ও'৬' শুক্রের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে নানা তথ্য পাঠায়। 'ভেনেরা-৭' শুক্রে নামে ১৯৭২-এর২২ জুলাই। 'ভেনেরা-৯' শুক্রের কক্ষে স্থাপিত হয় ১৯৭৫-এর ২২ অক্টোবর। তার থেকে নভোযান নামে শুক্রের পিঠে। 'ভেনেরা-১০' শুক্রের কক্ষ থেকে নভোযান নামায় ১৯৭৫-এর ২৫ অক্টোবর। 'ভেনেরা-১৩' ও 'ভেনেরা-১৪' থেকে শুক্রের পিঠে নভোযান নামে যথাক্রমে ১৯৮২-র ১৩ মার্চ। রঙিন ছবি ও প্রেরিত তথ্য থেকে জানা যায় শুক্রের তাপমাত্রা আন্দাজ ৪৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, তার বায়ুমণ্ডলের শতকরা ৯০ শতাংশই কার্বন ডাই-অক্সাইড। 'ভেনেরা-১৫' ও'১৬' শুক্রে পৌঁছয় ১৯৮৩-র অক্টোবর।

১৯৬০ থেকে ১৯৬৭-র মধ্যে আমেরিকার 'পায়োনিয়র-৫' থেকে'৮' অবধি চারটি আন্তর্গ্রহ যান রওনা হয় শুক্রে।

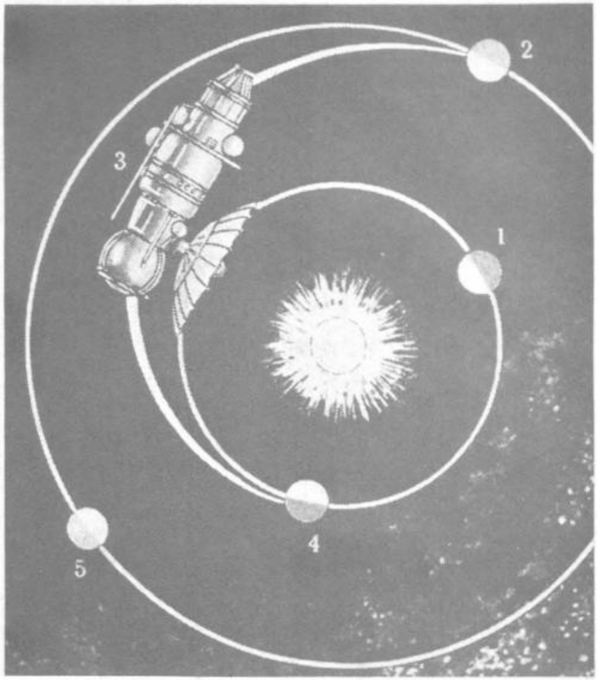

স্বয়ংক্রিয় উপগ্রহ স্টেশন 'ভেনেরা-৫'
স্টেশনের যাত্রা শুরুর সময় শুক্রগ্রহ (1) এবং পৃথিবীর (2) অবস্থান ; স্টেশনটির শুক্রগ্রহের কাছাকাছি আসার সময় পৃথিবী (5) এবং শুক্রগ্রহের (4) অবস্থান ; উড্ডয়ন পথের সংশোধন (3)

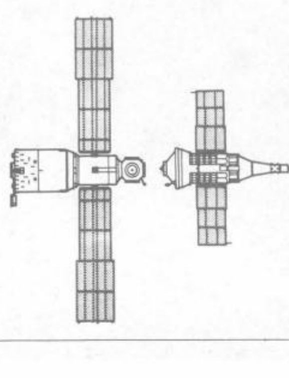

রাশিয়ার 'মার্স' ও আমেরিকার 'মেরিনার' নামধারী বিভিন্ন স্পেস-স্টেশনের লক্ষ্য ছিল মঙ্গল। ১৯৭৪-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি 'মার্স-৫' মঙ্গলের কৃত্রিম উপগ্রহ রূপে গ্রহটির বিশদ বিবরণসমৃদ্ধ ফোটো পাঠায়। আমেরিকার আন্তর্গ্রহ স্পেস-স্টেশন 'ভাইকিং'-১' ও 'ভাইকিং-২' থেকে ১৯৭৬-এর ২২ জুলাই ও ৩ সেপ্টেম্বর দু'টি নভোযান মঙ্গলে ধীরে অবতরণ করে। পাঠায় এ-যাবৎ অজানা বহু খবর।

'পায়োনিয়র-১০' নামে স্পেস-স্টেশন ছাড়া হয় ১৯৭২-এর ১০ মার্চ। ২৫ লক্ষ কিলোমিটার দূর দিয়ে বৃহস্পতিকে পার হওয়ার সময় বহু আলোকচিত্র গ্রহণ করে এবং ১৯৮৩-র ১৩ জুন সৌরলোক পেরিয়ে চলে যায়। 'পায়োনিয়র-১০'-এ আছে একটি সচিত্র ফলক, ভিন গ্রহ বা ভিন তারার বুদ্ধিমান জীবের কাছে মানুষের কথা পৌঁছে দেওয়ার আশায়।

১৯৭৪-এর ৩ ডিসেম্বর 'পায়োনিয়র-১১' বৃহস্পতির ৪৩,০০০ কি·মি· দূর দিয়ে ঘণ্টায় ১,৭১,০০০ কি·মি· বেগে চলে যায় শনির উদ্দেশে। তখন পর্যন্ত এটাই মহাকাশযানের রেকর্ড গতি।

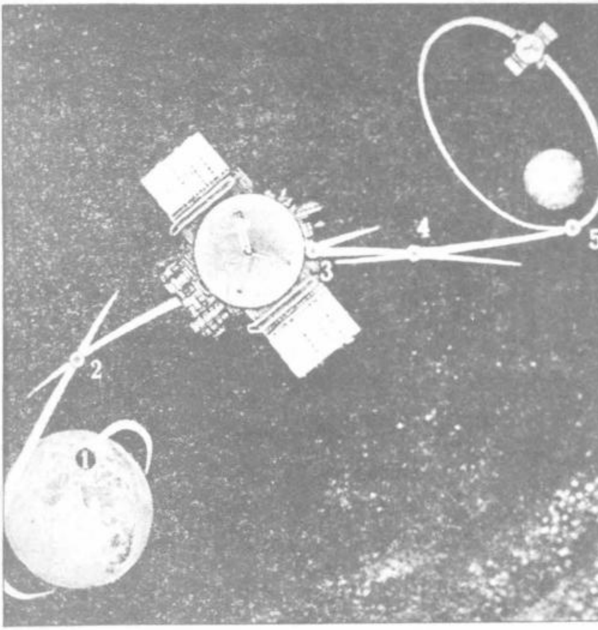

স্বয়ংক্রিয় আন্তর্গ্রহ স্টেশন 'মার্স-৫'
1—যাত্রা শুরু 2—4-উড্ডয়ন পথের সংশোধন 5—মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথে স্টেশনটি স্থাপনের জন্য গতিরোধ

গ্রহান্তরের বুদ্ধিমান জীবের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের আশায় পায়োনিয়র-১০-এর সঙ্গে প্রেরিত ফলক

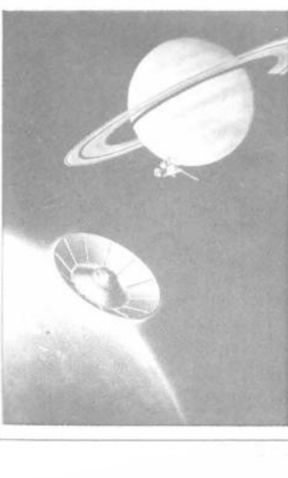

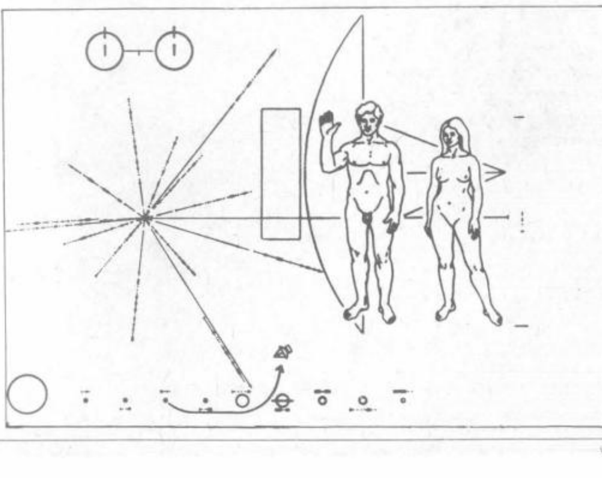

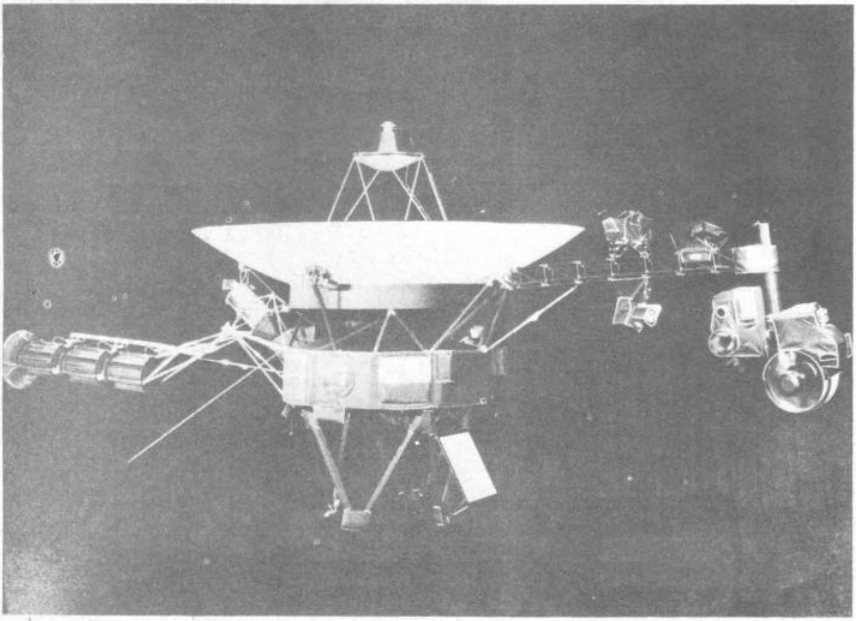

ভয়েজার-১ ও ২-এর মধ্যে চেহারায় কোনও পার্থক্য নেই

আমেরিকার আন্তর্গ্রহ স্টেশন 'ভয়েজার-১' ও 'ভয়েজার-২' বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর বহু অজানা তথ্য সরবরাহ করেছে।

১৯৮৯-র ২৫ অগস্ট ভয়েজার-২ নেপচুনের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময়ে বহু ছবি তুলেছে, জানিয়েছে নেপচুনের বৃহত্তম উপগ্রহ ট্রিটন সম্বন্ধে অজানা খবর। প্রায় তিরিশ কিলোমিটার দূর অবধি আগ্নেয়গিরি থেকে নাইট্রোজেন বাষ্প উদ্গিরন কথা জেনেছি আমরা। ভয়েজার-২ ছাড়া হয় ১৯৭৭-এর ২০ অগস্ট। ৬৭,০০০ কি·মি·/ঘণ্টা বেগে নেপচুনে পৌঁছতে তার অন্তত চল্লিশ বছর লাগার কথা। কিন্তু বারো বছরেই সেটা সম্ভব হয়েছে 'মহাকর্ষ সাহায্য' (gravity assist) গ্রহণের দরুন। ১৯৬৫-তে আমেরিকার বিজ্ঞানী ফ্ল্যান্ডো ও মিনোভিচ দেখান, কোনও বৃহৎ গ্রহের মহাকর্ষকে এমনভাবে কাজে লাগানো সম্ভব যাতে একটি মহাকাশযানের গতি ও তার পথের দিশা পরিবর্তন করা যায়। বৃহস্পতির মহাকর্ষ-শক্তিকে কাজে লাগানোর উপযোগী ভয়েজার-২ তৈরির পরিকল্পনা করে পাসেডেনার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরি।

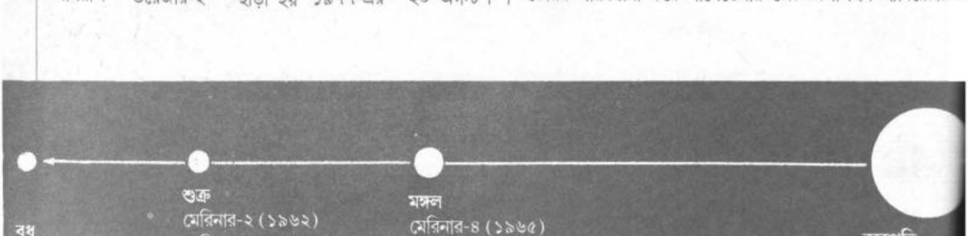

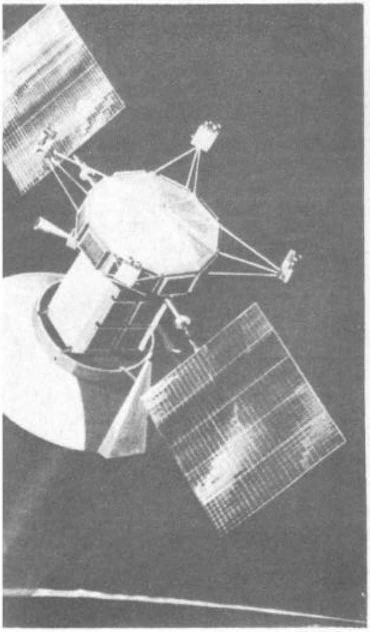

আমেরিকার আন্তগ্রহ অভিযানের জন্য নভোযান 'ম্যাগেলান'

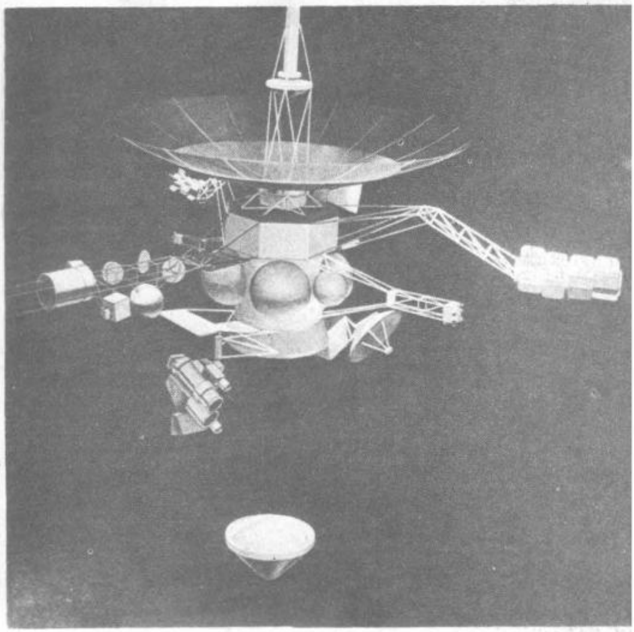

আন্তগ্রহ অভিযানের জন্য আর একটি মার্কিন নভোযান 'গ্যালিলেও'।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ভয়েজার-১ ও ভয়েজার -২ নির্মিত হয়েছিল চার বছরের মধ্যে বৃহস্পতি ও শনি পর্যবেক্ষণের জন্য। বারো বছর পেরিয়ে গেছে, ভয়েজার-২ এখনও কিন্তু সচল। নেপচুনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আগেই ভয়েজার বৃহস্পতির ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ উপগ্রহের অস্তিত্বের কথা জানিয়েছিল। ভয়েজার-২ বৃহস্পতি, অসংখ্য বলয় নিয়ে শনি, ইউরেনাস, ট্রিটন ও নেপচুনের অসংখ্য ফোটো পাঠিয়েছে।

ভয়েজার-১ ছাড়া হয় ১৯৭৭-এর ৫ সেপ্টেম্বর। ১৯৮০-র শেষ দিকে সেটি শনির ছবি পাঠায়। ভয়েজার-১ প্রেরিত তথ্য থেকেই ধরা পড়ে যে, শনির উপগ্রহ টাইটানের ব্যাস এতদিন যা জানা ছিল, তার চেয়ে কম। ফলে, বৃহস্পতির উপগ্রহ গানিমিড এখন সৌরলোকের বৃহত্তম উপগ্রহ রূপে স্বীকৃত।

সম্প্রতি আমেরিকা ম্যাগেলান (মে, ১৯৮৯) ও গ্যালিলেও (অক্টোবর, ১৯৮৯) প্রেরণ করেছে যথাক্রমে শুক্র ও বৃহস্পতির দিকে।

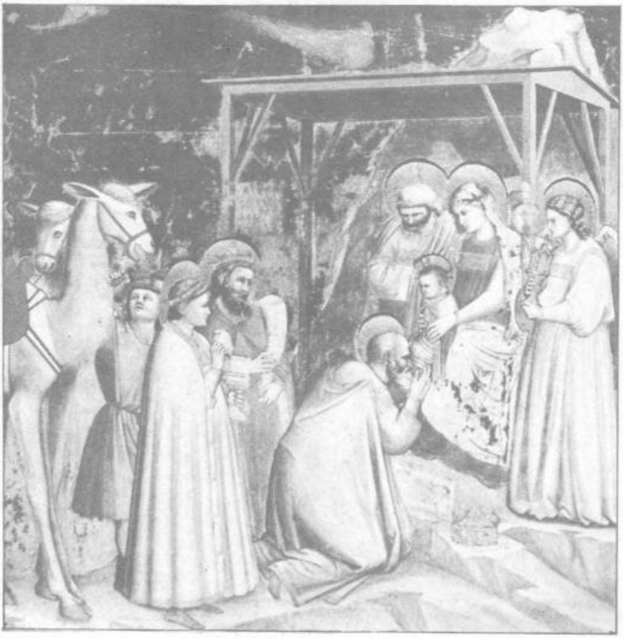

১৩০১ খ্রিস্টাব্দে সম্ভবত হ্যালির ধূমকেতু দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে ইতালির জিয়োত্তো দি বনদোনি (১২৬৭-১৩৩৭) ওপরের ছবিটি আঁকেন। এই শিল্পীর নামেই ব্যোমযানের নাম রাখা হয়।

ব্যোমযান জিয়োত্তোর ছবি

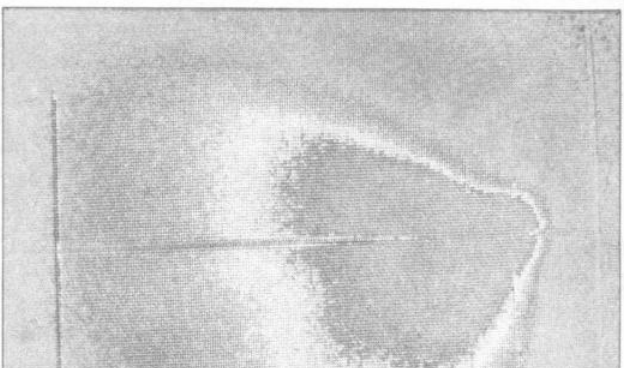

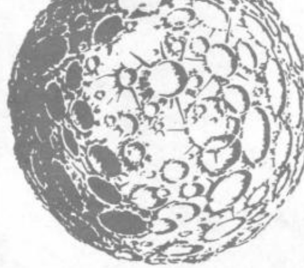

ধূমকেতু মাত্রেই মানুষের কাছে বিস্ময়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছেও প্রায় অচেনা বস্তু। পৃথিবীকে নিয়মিত ব্যবধানে দর্শন দেয় হ্যালির ধূমকেতু। সম্প্রতি সেটি আবার এসেছিল। সেই সময়ে ১৯৮৯-র ৬ ও ৭ মার্চ মাত্র আট থেকে নয় হাজার কিলোমিটার দূর থেকে এই ধূমকেতুর ছবি তোলে (বাঁ দিকে) রাশিয়ার ভেগা ও ইউরোপিয়ান স্পেস-এজেন্সির 'জিয়োত্তো' ব্যোমযান।

মহাকাশ-গবেষণার সূত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার নানা উন্নতি ঘটেছে, যা মানুষের কল্যাণে এসেছে। আবিষ্কার হয়েছে নতুন ধাতুসংকর, নতুন এঞ্জিন, ক্যামেরা ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। মহাকাশ-অভিযানের জন্য পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের খতিয়ান নেওয়ার কাজ অনেক সহজ হয়েছে। রিমোট সেন্সিং (দূরনিয়ন্ত্রিত অনুভব ব্যবস্থা) ও কম্পিউটারের সাহায্যে 'প্রাপ্ত তথ্য'কে অবিলম্বে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার ব্যাপারেও মহাকাশবিদ্যা আমাদের সহায়ক। কৃষি ও বাসযোগ্য জমি, নদী ও সাগরের সঠিক পরিচয় সংগ্রহেও সফল হয়েছি আমরা। ভূতত্ত্বও হয়েছে সমৃদ্ধ।

এখানে মহাকাশ থেকে তোলা পৃথিবীর কয়েকটি নাটকীয় এবং তথ্যবহুল ফোটোগ্রাফ।

লিবিয়ার মরুভূমিতে মানুষের তৈরি মরূদ্যান

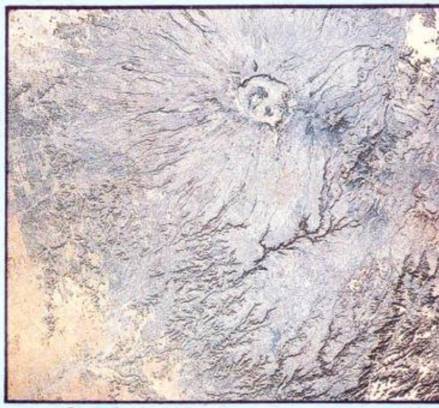

সাহারার এমি-কৌসসি আগ্নেয়গিরি

মহাকাশ থেকে তোলা আরও দু'টি ছবি। ডান দিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার শেষাংশে খনিজ সম্পদের আধার। নীচে, পঞ্জাব সংলগ্ন হিমালয়ে লাশকুল গ্লেসিয়ার ও মৌসুমী মেঘ আটকে থাকার চিত্র।

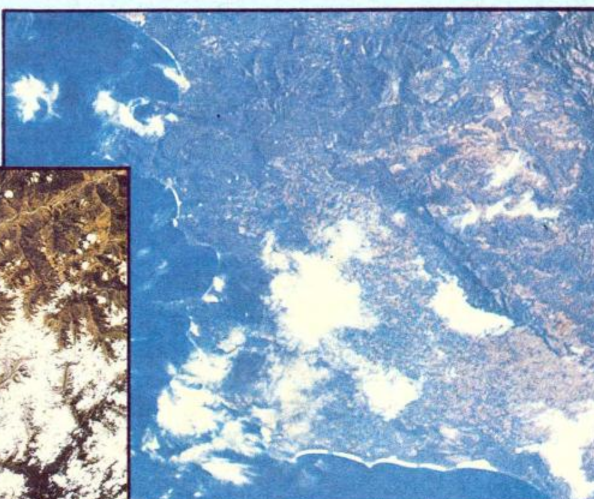

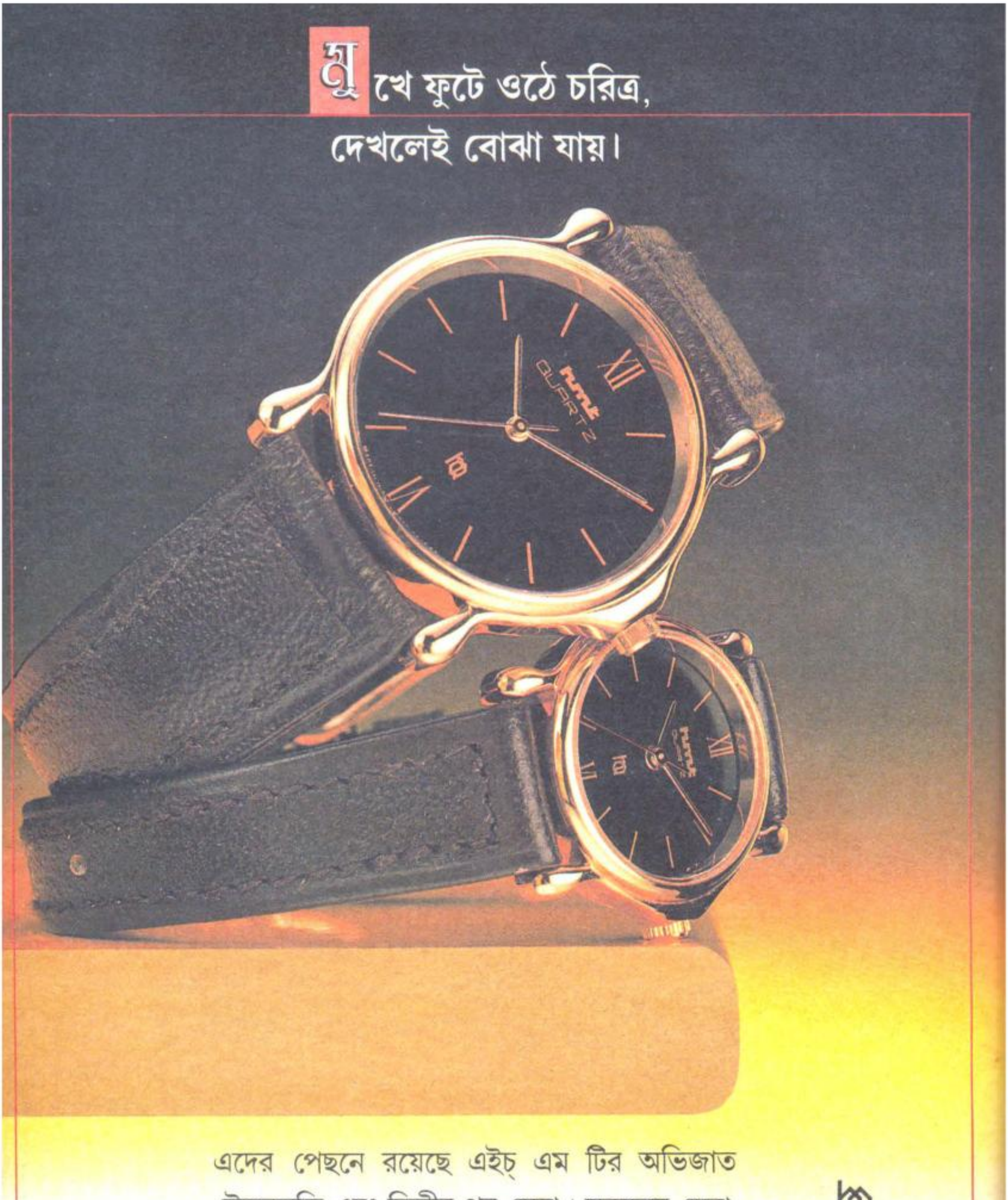
মুখে ফুটে ওঠে চরিত্র,
দেখলেই বোঝা যায়।
এদের পেছনে রয়েছে এইচ্ এম টির অভিজাত টেক্নলজি এবং বিক্রীর পর সেরা। সবচেয়ে সেরা, অন্যদের থেকে আলাদা, চরিত্র বলে।
hmt
QUARTZ

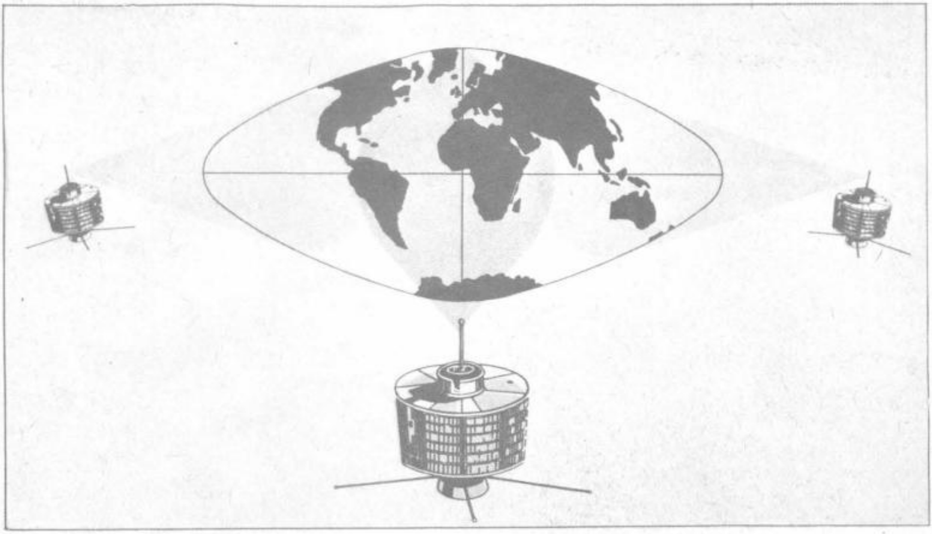

ভূ-সমলয় কক্ষে স্থাপিত তিনটি স্যাটেলাইটের আওতায় পুরো পৃথিবী

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর বিপরীত দুই প্রান্তের মধ্যেও বেতার মারফত সরাসরি টেলিফোন বা টেলিভিশন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। নিমেষের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি মাঠের ক্রিকেট খেলা, কি ক্রেমলিনে নেতাদের হ্যান্ডশেক দেখতে পাচ্ছি আমরা। বেতার সংকেতবাহী মাইক্রোওয়েভ চলে সরল পথে। পৃথিবীর আকৃতি গোল, তাই মাইক্রোওয়েভ প্রেরণের দু'টি টাওয়ারের মধ্যে দূরত্ব খুব বেশি রাখা যায় না। বেশি দূর সংকেত প্রেরণের জন্য স্যাটেলাইটকে মহাকাশের টাওয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

পৃথিবীর ৩৫,৮০০ কি·মি· ওপরে বিষুবরেখা বরাবর সমান দূরত্বে তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে থাকলে উপগ্রহগুলির বেগ পৃথিবীর নিজ অক্ষের ওপর ঘূর্ণনবেগের সমান হয়। তখন এদের প্রত্যেকটি পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে সব সময়ে তিনটি নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করে, এবং প্রত্যেকটির সাহায্যে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ করে অঞ্চলের সঙ্গে যোগ রক্ষা সম্ভব। এই ভূ-সমলয় কক্ষে স্থাপিত তিনটি মাত্র স্যাটেলাইটের দৌলতেই পৃথিবী জুড়ে টেলিকমিউনিকেশনের জাল বিছানো যায়।

মনুষ্যবিহীন আর এক ধরনের উপগ্রহ আবহাওয়ার খোঁজ পাঠায়। আবহাওয়া উপগ্রহের ক্যামেরায় তোলা মেঘের ফোটো জানিয়ে দেয় কোথায় কীরকম মেঘ তৈরি হচ্ছে, কখন ঝড়-বৃষ্টি বা জলোচ্ছ্বাস হবে।

মহাকাশ অভিযানের ফলেই কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পেস-স্টেশনের টেলিস্কোপের সাহায্যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে নতুন জানালা দিয়ে গ্রহ, তারা ও ধূমকেতু ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের সুযোগ মিলেছে। বায়োস্ফিয়ার, লিথোস্ফিয়ার, কি ম্যাগনেটোস্ফিয়ার সম্বন্ধে স্পেস-স্টেশন থেকে অবিরাম খবর আসছে। আন্তগ্রহ স্পেস-স্টেশনের অভাবে দশ বছর আগেও আমরা জানতে পারিনি যে, সৌরলোকে বুধ নয়, প্লুটোই ক্ষুদ্রতম গ্রহ।

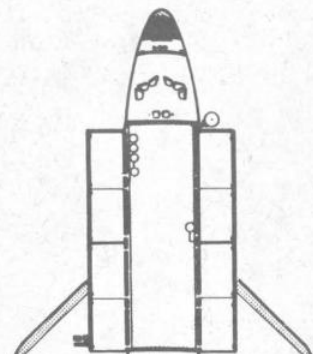

ডক্টর বিক্রম সারাভাই (১৯১৯-১৯৭১)। ভারতের মহাকাশ গবেষণার প্রথম রূপরেখা রচনা করেন এই পথিকৃৎ বিজ্ঞানী। মহাজাগতিক রশ্মি ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য ১৯৪৭-এ তিনি আহমেদাবাদে যে গবেষণাগার স্থাপন করেন সেটি কৃত্রিম উপগ্রহ নির্ভর একটি কেন্দ্র হিসাবে বিকশিত হয়।

সারাভাইয়ের দূরদর্শিতার জন্য ত্রিবান্দ্রামের কাছে আরব সাগরের উপকূলে থুম্বায় ভারতের প্রথম রকেট উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। সারাভাইয়ের অকাল মৃত্যুর পরে থুম্বার গবেষণা-কেন্দ্রের নাম রাখা হয় বিক্রম সারাভাই স্পেস-সেন্টার। ফরাসি সহযোগিতায় এখানে প্রথম রকেট তৈরির কাজ শুরু হয় ১৯৭১-এ। তার আগেই অবশ্য ১৯৬৭-র ২০ নভেম্বর এখান থেকে ভারতের প্রথম রকেট ছোট্ট রোহিণী ৭৫-কে ছাড়া হয়। থুম্বার অবস্থান চুম্বকীয় নিরক্ষরেখার ওপর, বায়ুমণ্ডল সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য রকেট-প্রেরণের পক্ষে যা আদর্শ। ১৯৬৩ সালে এই কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার পাঁচ বছর পরে ইউনাইটেড নেশন্‌স-এর এক ঘোষণা অনুসারে পৃথিবীর যে-কোনও দেশ শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে থুম্বাকে রকেট ছাড়ার কাজে ব্যবহার করতে পারে। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি ও জাপান থুম্বা থেকে রকেট পাঠিয়েছে।

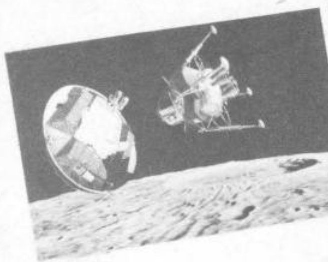

থুম্বা থেকে RH 200 সাউন্ডিং রকেট ছাড়া হচ্ছে

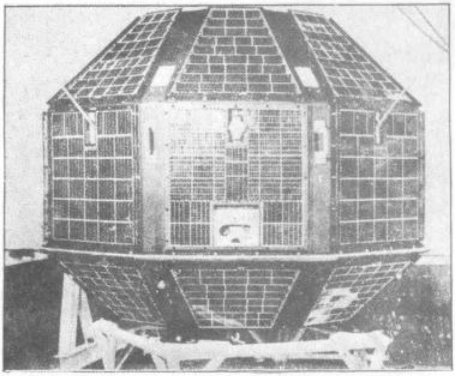

আর্যভট্ট। ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ। রাশিয়া থেকে রুশ রকেটে চড়ে ১৯৭৫-এর ১৯ এপ্রিল পাড়ি দিয়েছিল। ৩৬০ কেজি ওজনের স্যাটেলাইটের গায়ে লাগানো এই সোলার সেলগুলি সূর্যের আলো সরাসরি রূপান্তরিত করত বিদ্যুতে।

আর্যভট্টের নাম রাখা হয় দেড় হাজার বছর আগেকার প্রাচীন সেই ভারতীয় বিজ্ঞানীর সম্মানে, যিনি গণনা করে বার করেন যে, পৃথিবী তার অক্ষের ওপর পাক খায়। ভারতের আর-এক প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভাস্কর। ভারতের তৈরি ভাস্কর-১ ও ভাস্কর-২ স্যাটেলাইট দু'টিও রাশিয়া থেকে যথাক্রমে ১৯৭৯ ও ১৯৮১-এ পাঠানো হয়। রাশিয়া থেকে পাঠানো হলেও এদের সঙ্গে ভারতের শ্রীহরিকোটা কেন্দ্র রক্ষা করত সংযোগ। পৃথিবীর আবর্তন যাতে রকেট উৎক্ষেপণের সহায়ক হয়, তার জন্য ভারতের প্রধান রকেট লঞ্চিং-কেন্দ্র হিসেবে মাদ্রাজের কাছে শ্রীহরিকোটা নামে জনবিরল দ্বীপটিতে ঘাঁটি গড়া হয়। ভারতে তৈরি প্রথম তরল জ্বালানি বিশিষ্ট রকেট 'রোহিণী-৫৬০' এখান থেকে ১৯৭৩-এ ছাড়া হয়। চার পর্যায় বিশিষ্ট কঠিন জ্বালানির রকেট SLV-3 'রোহিণী-১' নামে স্যাটেলাইটকে নিয়ে ১৯৮০-র ১৮ জুলাই ও 'রোহিণী ডি ২'-কে নিয়ে ১৯৮৩-র এপ্রিলে এখান থেকেই পাড়ি দেয়।

শ্রীহরিকোটা থেকে পাড়ি দিচ্ছে ভারতের সাউণ্ডিং রকেট 'রোহিণী-৫৬০'

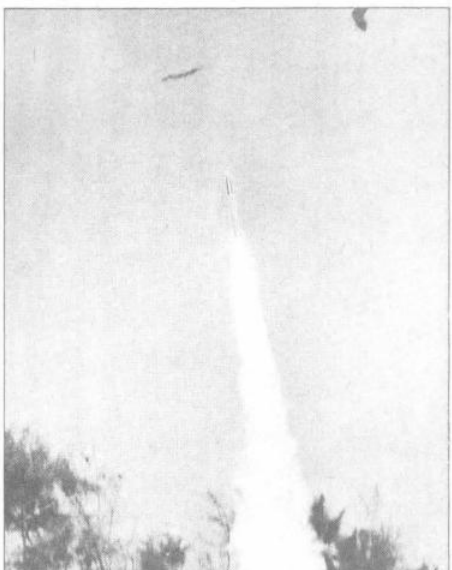

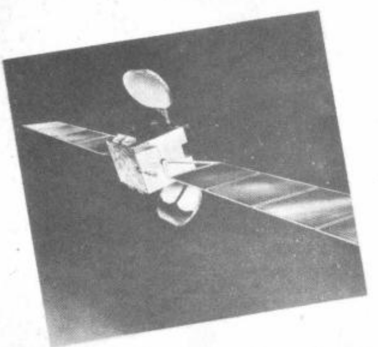

ভারতের মহাকাশ অভিযান : প্রধান কর্মসূচি

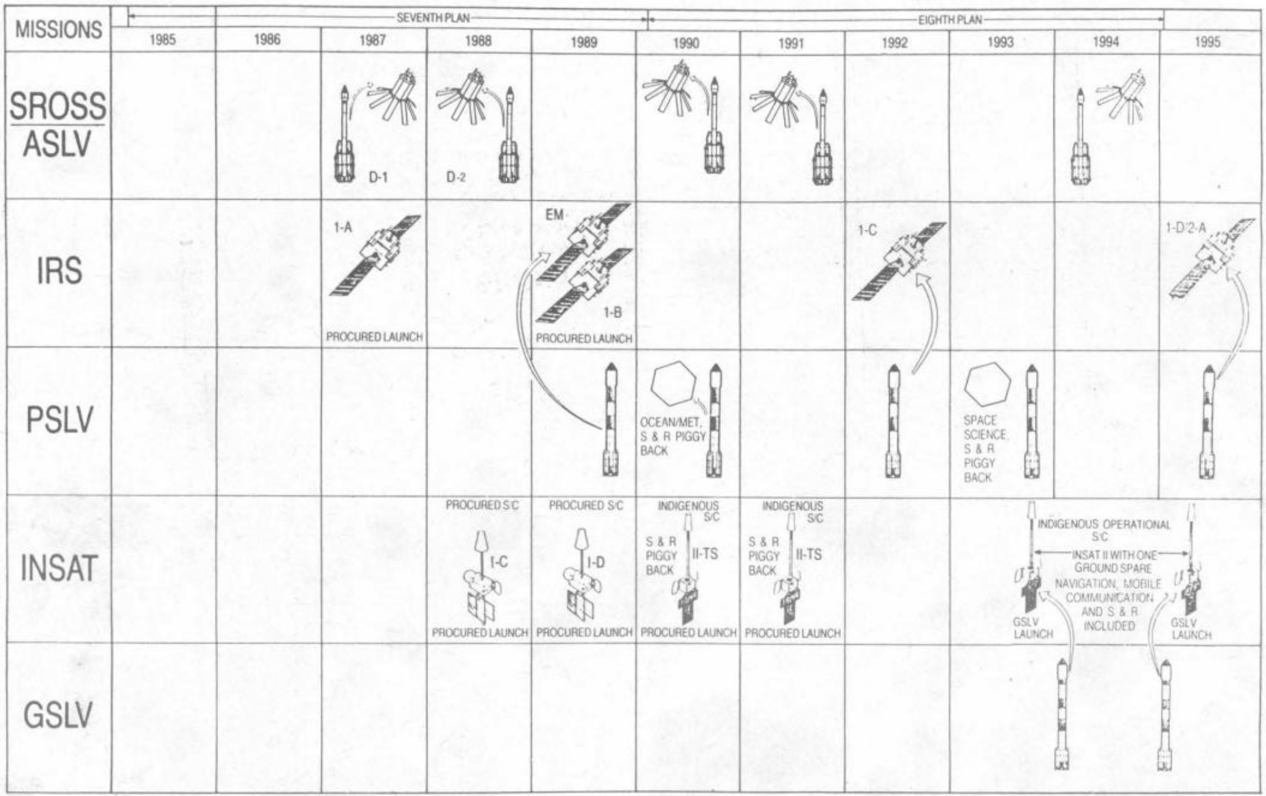

ASLV

Augmented Satellite Launch Vehicle

১৫০ কেজি অবধি ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহ। পৃথিবীর নিকট কক্ষপথে স্থাপনের জন্য এই রকেট নির্মাণ করা হচ্ছে। ASLV-র D1 মডেলের প্রথম রকেট ছাড়া হয় ১৯৮৭-র ২৪ মার্চ। D2 মডেলের কাজ চলেছে।

PSLV

Polar Satellite Launch Vehicle

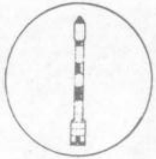

১০০০ কেজি অবধি ওজনের দূরভাষী কৃত্রিম উপগ্রহকে প্রায় ১০০০ কি-মি- উচ্চতায়, মেরু (polar) সমলয় কক্ষে স্থাপনের জন্য রকেট। ASLV-র মতো শুধু কঠিন জ্বালানি নয়, এর দ্বিতীয় পর্যায়ের মোটর 'বিকাশ' চালিত হবে তরল জ্বালানির সাহায্যে।

GSLV

Geo.-Synchronous Satellite Launch Vehicle

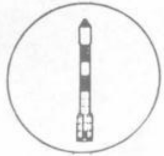

পৃথিবীর ৩৬,০০০ কি-মি- উর্ধ্বে ভূ-সমলয় কক্ষে INSAT জাতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের উপযোগী রকেট।

SROSS

Stretched Rohini Satellite Series

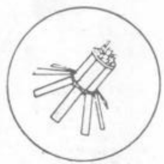

এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ১৫০ কেজি শ্রেণীভুক্ত স্যাটেলাইট ক্ষেপণ করা। এই শ্রেণীর প্রথম স্যাটেলাইট SROSS-1 কে ASLV-D1 রকেট দিয়ে ছাড়া হয়েছিল। কিন্তু সেটিকে কক্ষে স্থাপন করা যায়নি। পশ্চিম জার্মানির মহাকাশ গবেষণা সংস্থার সঙ্গে গৃহীত যুগ্ম পরিকল্পনা অনুসারে SROSS-2 নির্মাণের কাজ চলেছে। এটিকে বহন করবে ASLV-D2 রকেট।

IRS

Indian Remote Sensing Satellite

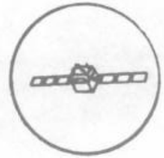

১০০০ কেজি ওজন বিশিষ্ট এই শ্রেণীর প্রথম স্যাটেলাইট IRS-IA ছাড়া হয়েছে রাশিয়া থেকে। LISS-1 ও LISS-2 নামে দু'টি ক্যামেরা এই স্যাটেলাইট থেকে হায়দরাবাদের গবেষণা কেন্দ্রে বহু ফোটোগ্রাফ পাঠিয়েছে, যা ভারতের কৃষি, বন ও জল-সম্পদের রক্ষা ও উন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

INSAT-1

Indian National Satellite System

দেশের নানা ধরনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বহুমুখী ব্যবহারের উপযোগী এই কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থার সহায়তায় আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ও ভবিষ্যদ্বার্তা এবং সুদূর গ্রামাঞ্চল অবধি টেলিভিশন কার্যক্রম প্রচার সম্ভব। ফোর্ড এরোস্পেস কর্পোরেশন নির্মিত INSAT-IB স্যাটেলাইট, ১৯৮৩-র অগস্ট থেকে এখনও কার্যরত।

INSAT-II TS

Insat II Test Satellite

বিদেশী INSAT-I-র পরিবর্তে ভারতের নিজস্ব কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণের প্রস্তুতি চলছে। একই নামধারী পূর্বসূরীদের চেয়ে এই স্যাটেলাইট আকারে বড় হবে এবং প্রয়োগক্ষেত্রও হবে বৃহত্তর। এই স্যাটেলাইটকে ভূ-সমলয় কক্ষে স্থাপন করবে ভারতীয় GSLV রকেট।

ভারতের মহাকাশ গবেষণা-কেন্দ্র

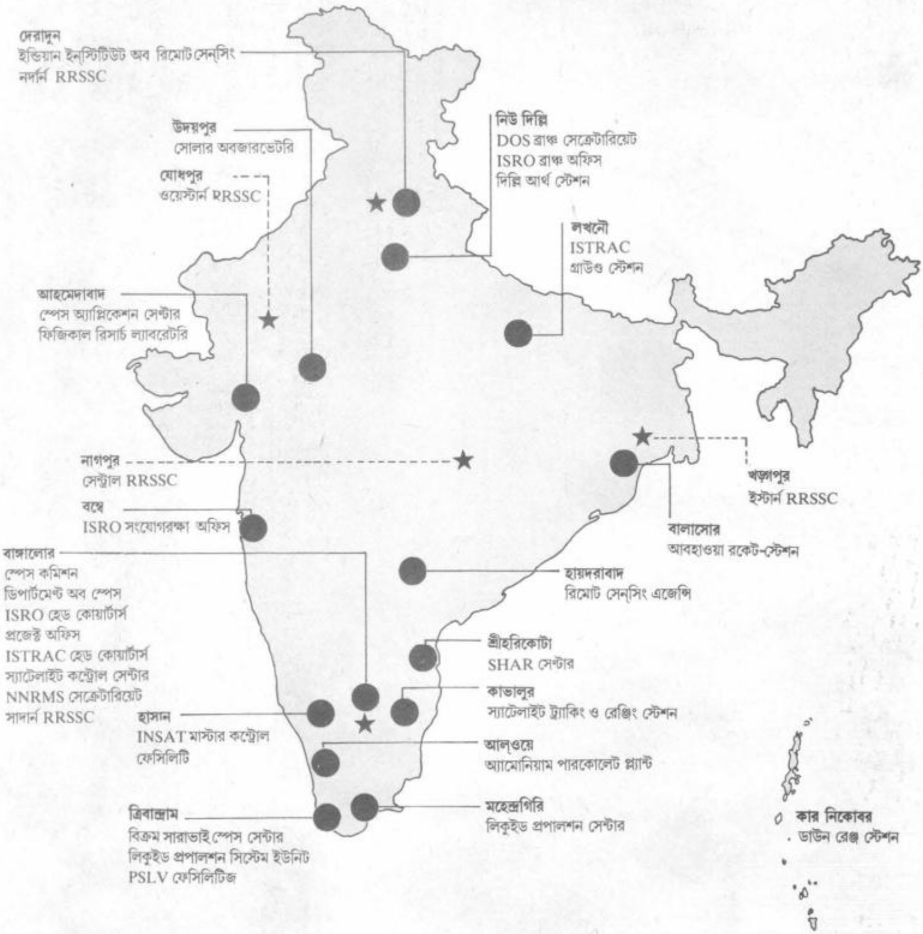

RRSSC : রিজিওনাল রিমোট সেন্‌সিং সার্ভিস সেন্টার
ISRO : ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অরগানাইজেশন
ISTRAC : ইস্‌রো টেলিমেট্রি, ট্র্যাকিং অ্যান্ড কমান্ড নেটওয়ার্ক
NNRMS : ন্যাশনাল ন্যাচারাল রিসোর্সেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
DOS : ডিপার্টমেন্ট অব স্পেস, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া

ভারতের সাউণ্ডিং রকেটের পরিবারের নাম রোহিণী। সাউন্ডিং রকেট আবহাওয়া এবং উচ্চ বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয়। ভারতের সাউন্ডিং রকেট রোহিণী নামে পরিচিত ত্রিবান্দ্রমের বিক্রম সারাভাই স্পেস-সেন্টার বিভিন্ন ধরনের 'রোহিণী' তৈরি করেন এবং থুম্বা, শ্রীহরিকোটা ও ওড়িশার বালাসোরের রকেট ক্ষেত্র থেকে তাদের নিয়মিত উৎক্ষেপণ করা হয়।

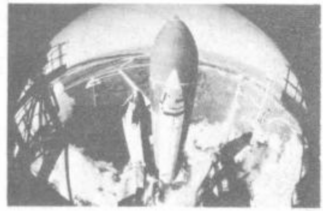

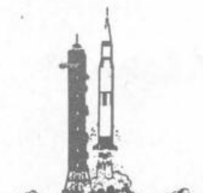

রোহিণী : এক নজরের তুলনা

বৈশিষ্ট্য	রকেটের নাম		
	RH-200	RH-300	RH-560
পর্যায় সংখ্যা	২	১	২
দৈর্ঘ্য, মিটার	৩·৬	৪·৪	৭·৭
সামগ্রিক ওজন, কেজি	১০৮	৩৭০	১৩৫০
পে-লোড ওজন, কেজি (বাহিত মালের ওজন)	১০	৫০	১০০
উচ্চতা, কিমি	৮০	১৪০	~৩৫০
ব্যবহারিক ক্ষেত্র	আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ	মধ্য বায়ুমণ্ডল পর্যবেক্ষণ	আয়োনোস্ফিয়ার পর্যবেক্ষণ

রোহিণী রকেটের পরিবার

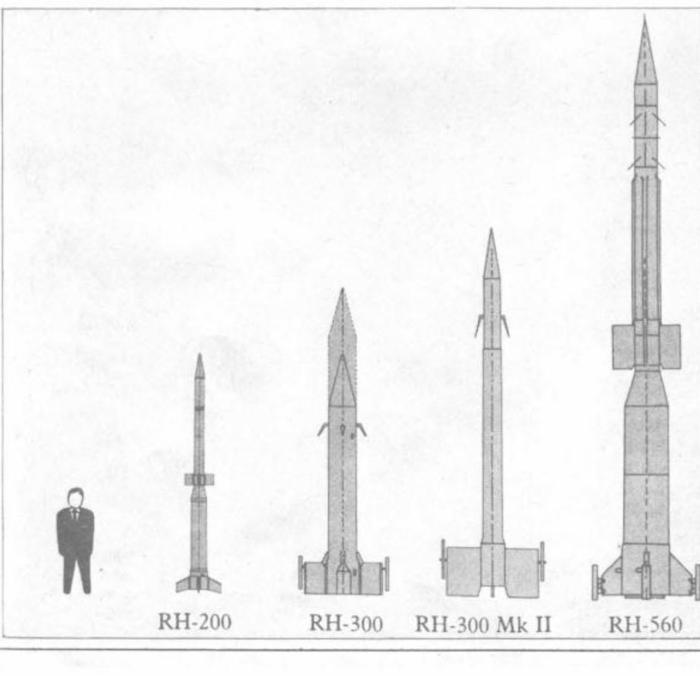

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহ IRS 1A বহন করে রুশ রকেট ভোস্তক রাশিয়ার বৈকানুর কসমোড্রম থেকে ১৯৮৮-র ১৭ মার্চ পাড়ি দিল তুষারঝড় উপেক্ষা করে। ISRO-তে তৈরি প্রথম 'রিমোট সেন্‌সিং স্যাটেলাইট'টি ISRO-IA নামে পরিচিত। উৎক্ষেপণের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে IRS 1A-র LISS 1 ক্যামেরা চালু হয়। শাদনগরের ন্যাশনাল রিমোট সেন্‌সিং এজেন্সির (NRSA) প্রযুক্তিবিদরা উল্লসিত হয়ে ওঠেন প্রথমেই যখন গঙ্গা নদী ও তার দু' পাড়ের এই ছবি (নীচে) ধরা পড়ে মনিটরিং-স্ক্রিনে। ভারতের ওপর দিয়ে এই কৃত্রিম উপগ্রহের প্রথম পাড়ি দেওয়ার পথটি মানচিত্রে নির্দেশিত।

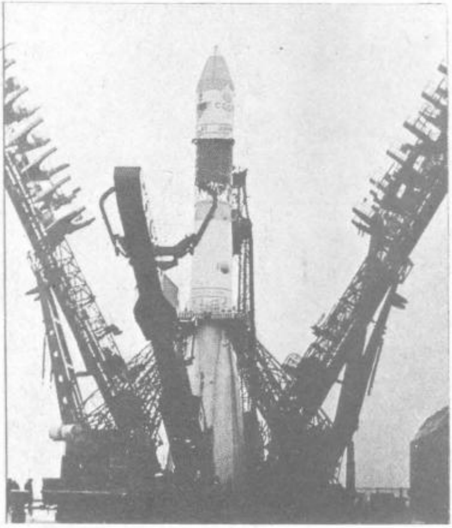

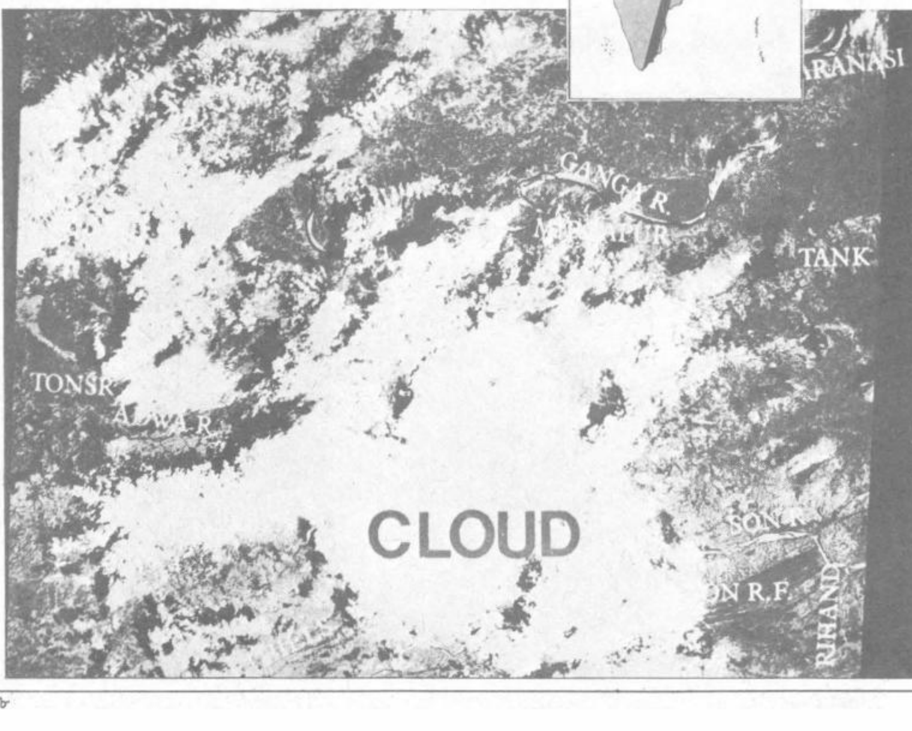

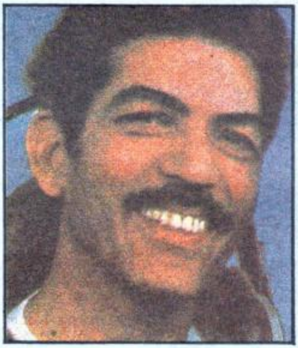
রবীশ মালহোত্রা

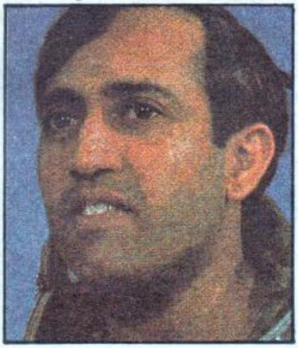
রাকেশ শর্মা

ভারতীয় বিমানবাহিনীর স্কোয়াড্রন লিডার রাকেশ শর্মা ও উইং কম্যান্ডার রবীশ মালহোত্রা রাশিয়ায় নভশ্চর হিসেবে প্রশিক্ষণ লাভের জন্য নির্বাচিত হন। ভারতের প্রথম মহাকাশচারী রাকেশ শর্মা বৈকানুর কসমোড্রম থেকে 'সয়ুজ টি-১১' চড়ে পাড়ি দেন ১৯৮৪-র ৩ এপ্রিল। তিন রুশ সহযাত্রীসহ তিনি মহাকাশের 'স্যালিউট-৭' স্টেশনের নভশ্চরদের সঙ্গে মিলিত হন পরের দিন।

ডান দিকে, সমুদ্রে অবতরণের পর মশাল জ্বালিয়ে উদ্ধারকারী বাহিনীর দৃষ্টি আকর্ষণের মহড়া দিচ্ছেন রাকেশ শর্মা। স্পেস-স্টেশনে সাত দিন নানা গবেষণায় কাটিয়ে রাকেশ পৃথিবীতে ফেরেন ১১ এপ্রিল। নীচে, টেরা প্রকল্পের জন্য মহাকাশ থেকে রাকেশ গৃহীত কচ্ছ উপসাগরের এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রে কীভাবে কৃষি ও শিল্পজাত দূষিত পদার্থ এসে পড়ে।

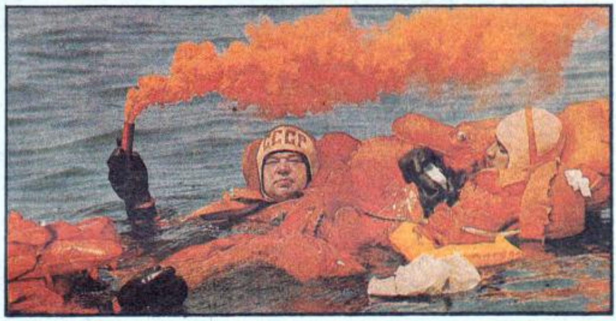

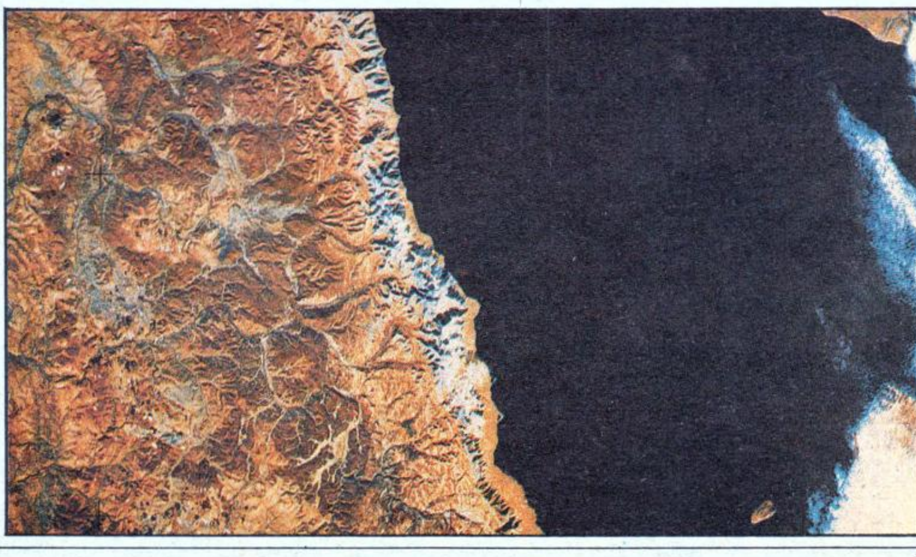

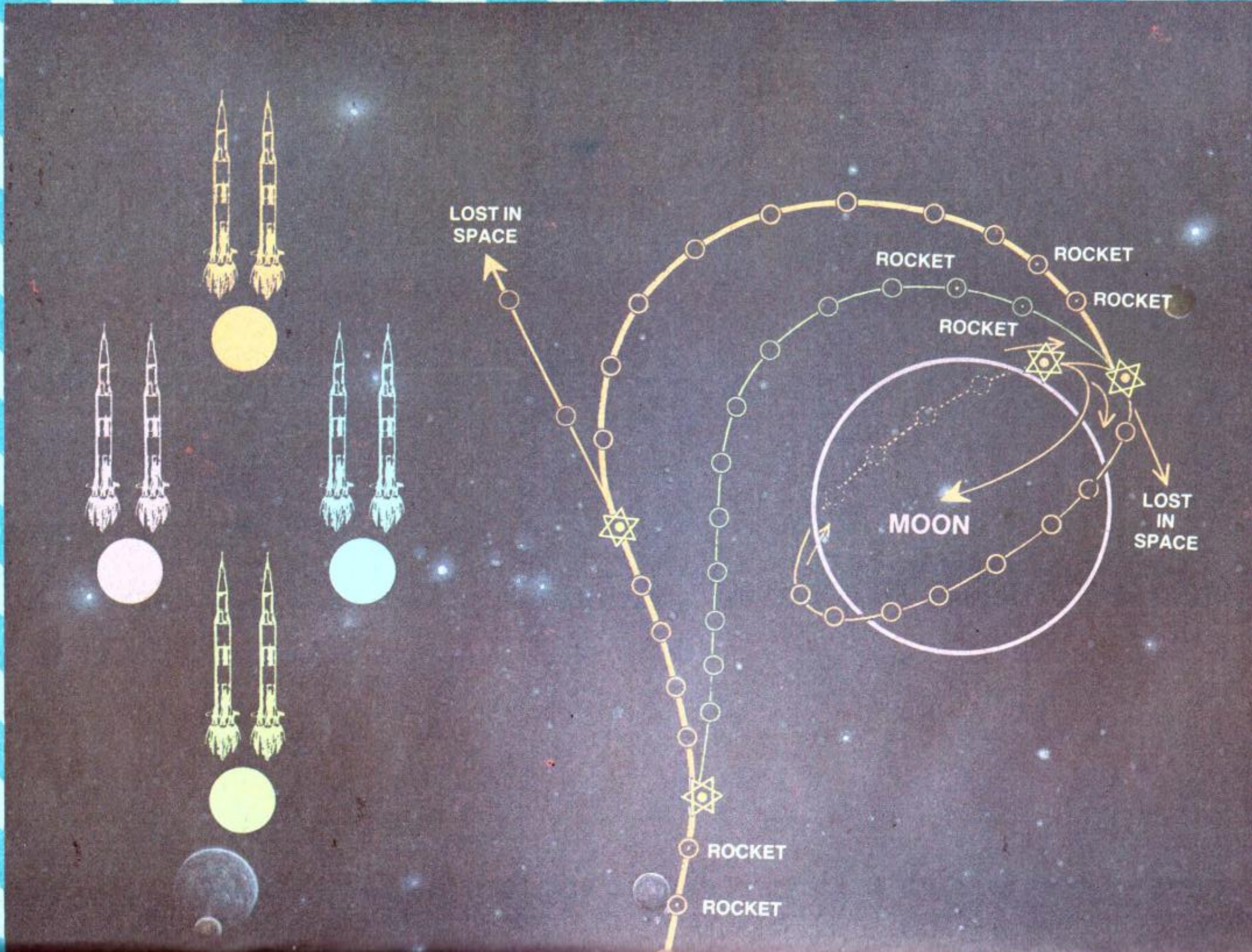

LOST IN SPACE
ROCKET
ROCKET
ROCKET
ROCKET
MOON
LOST IN SPACE
ROCKET
ROCKET

মহাকাশ অভিযানের আশ্চর্য খেলা

কাউন্ট ডাউন

পরিকল্পনা
সিদ্ধার্থ ঘোষ

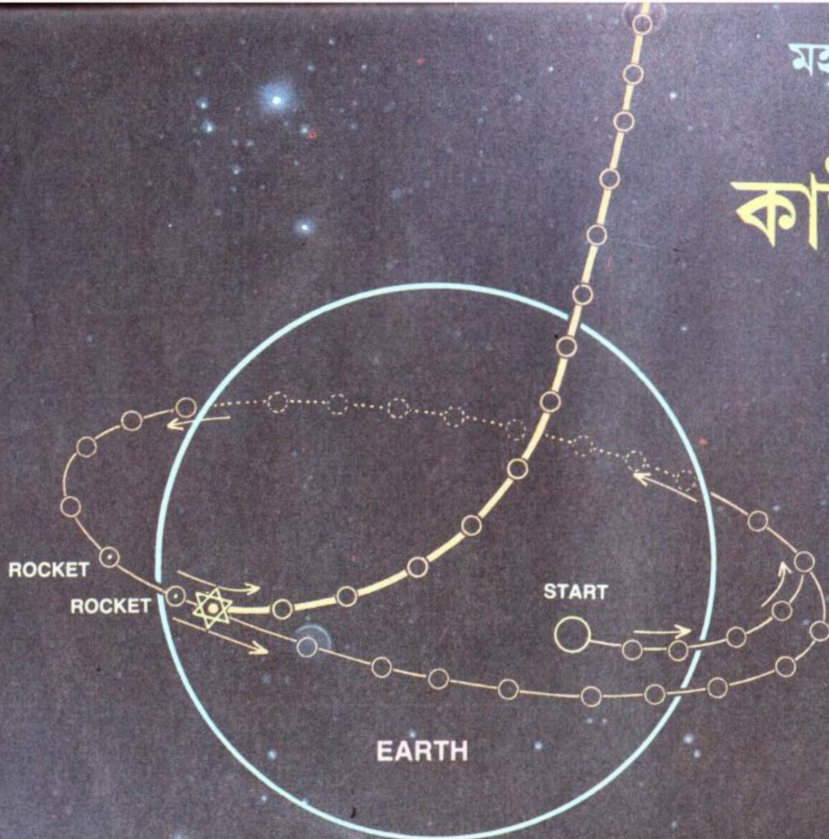

LINTAS SU 402 2416 BG

হিন্দুস্তান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

প্রথম ইংলিশ ক্রিকেট-দলের কলকাতা সফরের শতবার্ষিকী

সুব্রত সরকার

ঠিক একশো বছর আগের কথা। ১৮৮৯-এর ডিসেম্বর। কলকাতা তখন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার রাজধানী। ক্রিসমাস, নিউ ইয়ারের সময়ে সাহেবপাড়া দারুণ মেতে ওঠে। আর সেবার এক বিশেষ আকর্ষণ: প্রথম ইংল্যান্ড থেকে একটি ক্রিকেট-দল খেলতে এসেছে।

তখনকার দিনে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সফরের আয়োজন করা হত কারও কারও ব্যক্তিগত চেষ্টায়। তার দু'বছর আগে জর্জ ভারনন দল নিয়ে যান অস্ট্রেলিয়ায়। সে-দেশে আগের এক সফরে তিনি ইংল্যান্ডের হয়ে টেস্ট ম্যাচেও খেলেছিলেন। ১৮৮৯-এর ৩১ অক্টোবর ভারননের নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনায় এক ক্রিকেট-দল ইংল্যান্ডের টিলবারি বন্দর থেকে রওনা হয়।

নভেম্বরের শেষে কলম্বোতে পৌঁছে, সেখানে দুটি ম্যাচ খেলে দলটি জলপথে কলকাতায় চলে আসে। শহর তখন মহারানি ভিক্টোরিয়ার নাতি প্রিন্স অ্যালবার্ট ভিক্টরের আসন্ন ভ্রমণের জন্য সেজে উঠছে।

কলকাতার ক্রিকেট সেই সময়ে প্রায় পুরোপুরি ইংরেজদেরই খেলা। ক্যালকাটা ক্রিকেট-ক্লাব তখনই বহু বছরের পুরনো, তাদের মাঠ ইডেন গার্ডেন্স। আর ১৮৬৪-তে স্থাপিত বালিগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাবের প্রাঙ্গণ সেখানেই, যাকে এখন বলা হয় সি সি অ্যান্ড এফ সি মাঠ। এই দুই ক্লাব ছাড়া কলকাতার সেকালের আর এক নামকরা ক্রিকেট-দল ডালহাউসি ক্লাব।

ভারননের টিম কলকাতায় দুটি ম্যাচ খেলে, দুটিই ইডেনে। তাদের প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যালকাটা ক্রিকেট-ক্লাব। দু'দিনের এই ম্যাচ আরম্ভ হয় সোমবার, ২৩ ডিসেম্বর, ১৮৮৯। বড়দিনের উৎসবের জের কেটে যাওয়ার পরে, ৩১ ডিসেম্বর আরম্ভ হয় তিনদিনের খেলা, 'বেঙ্গল' দলের বিপক্ষে।

ইংরেজ ক্রিকেট ঐতিহাসিকদের মতে, ভারননের ওই দল আর তাদের খেলাগুলিকে প্রথম শ্রেণীর আখ্যা দেওয়া যায় না। ভারনন ছাড়া দলের আরও দুজন খেলোয়াড় পরে টেস্ট ম্যাচে ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করেন। এঁরা হলেন দলের উইকেটরক্ষক হিল্টন ফিলিপ্‌সন আর ব্যাটসম্যান লর্ড হক। ফিলিপ্‌সন ১৮৯১-৯২'র অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম টেস্ট খেলেন, হক তারও চার বছর পরে।

ইডেনে প্রথম খেলায় ক্যালকাটার ওপেনার এডমন্ড গ্রিনওয়ে প্রথম ইনিংসে অপরাজিত ১৩০ রান করেন। ভারননের একাদশের পক্ষে আর্থার গিবস্‌ন শতরান করেন, তবে ক্যালকাটা দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যর্থ হলে বিদেশীরা ম্যাচ অনায়াসে ন' উইকেটে জিতে যায়। পরের খেলায় ভারননের টিম বেঙ্গল দলকে ইনিংস আর ১৭ রানে পরাজিত করে।

কলকাতার পর ভারনন সাহেবের দল বাঁকিপুর, এলাহাবাদ, বোম্বাই, লখনউ, আগ্রা, মিরাট আর লাহোরে খেলে স্বদেশে রওনা হয়। সফরে তাদের একমাত্র পরাজয় বোম্বাইয়ে পার্সি দলের কাছে।

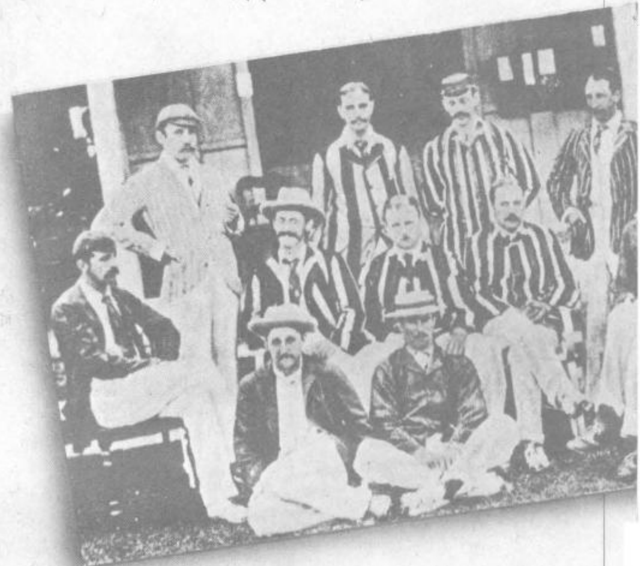

ভারননের এই দলটিই ভারতে এসেছিল

ইডেনে এই প্রথম ইংল্যান্ড থেকে আগত ক্রিকেট দলের খেলা পুরোপুরি সাহেবদেরই ব্যাপার ছিল। তবে ভারননের সফর বাঙালিদের মধ্যেও উৎসাহ সৃষ্টি করে। বাংলার ক্রিকেটের জনক সারদারঞ্জন রায় তখন কলকাতায় হয়তো ছিলেন না, তবে কোচবিহারের রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ এর কয়েক বছরের মধ্যেই নিজের ক্রিকেট টিম গড়েন, আর তালিম দেওয়ার জন্য ইংল্যান্ড থেকে পেশাদারদের নিয়ে আসেন। অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত প্রেসিডেন্সি কলেজ ক্রিকেট-ক্লাবও নিশ্চয় ভারননের সফরে প্রভাবিত হয়। ভারননের ভারত সফরের শতবার্ষিকী তাই কলকাতার ক্রিকেট অনুরাগীদের ভুলে যাওয়ার কথা নয়!

পূর্ব প্রকাশিতের পর

গৌতম সরকার

মাঝমাঠের লড়াই

অপমানিত হয়ে ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে মোহনবাগান ক্লাবে আসাটা আমি মনে মনে মানতে পারছিলাম না ঠিকই; কিন্তু আমারই পাড়ার পরিচিত এক ভাই ব্যাপারটা মানতে পারছিল না অন্য এক কারণে এবং সেটা বেশ মজার। ছেলেটি ছেলেবেলায় ছিল মোহনবাগান সমর্থক। কিন্তু পরে আমার খেলা দেখার পর আমার অন্ধ ভক্ত হয়ে পড়ে। যেহেতু তখন আমি ইস্টবেঙ্গলে ছিলাম, ও ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক হয়ে যায়। আমি তো ইস্টবেঙ্গল ছাড়লাম এবং এলাম মোহনবাগানে, মুশকিলে পড়ে গেল ও। সই-সাবুদ করে ক্লাব পালটানোর পর একদিন সকালে বাড়িতে বসে আছি, করুণ মুখ করে ও এসে আমাকে বলল, "এটা কী হল গৌতমদা, পাড়ায় তো আমি মুখ দেখাতে পারব না! আমি আবার মোহনবাগানে ফিরলে বন্ধুরা কী বলবে?"

হাসব, না কাঁদব বুঝতে পারছিলাম না, ক্লাব পালটানোয় এরকম যে ঝামেলা হয় তা জানা ছিল না! তবে সত্যি বলতে কি, ইস্টবেঙ্গল ছাড়ায় প্রবল মানসিক আঘাত পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু ক্লাব বদলের ফলে আর কোনও অসুবিধাতেই আমাকে পড়তে হয়নি। কারণ, আমার অধিকাংশ বন্ধু, তথা সহ খেলোয়াড়ই ১৯৭৭-এ মোহনবাগানে খেলছিল। হাবিব, আকবর, সুভাষ এবং আমি, সুধীর, শ্যাম একসঙ্গে আবার জড়ো হলাম। এমনকী, আমার প্রিয় কোচ প্রদীপদাকেও পেয়ে গেলাম মোহনবাগানে।

অপমানের জ্বালা তো ছিলই, সঙ্গে যুক্ত হল আর একটা জেদ। পথেঘাটে, অফিসে সব জায়গাতেই শুনতাম একটা কথা— ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে যেসব প্লেয়ার মোহনবাগানে গেছে, তারা নাকি কেউই আর সাফল্য পায়নি। অনেক 'বিজ্ঞ ব্যক্তি' তাই ঘাড় নেড়ে এই সিদ্ধান্তে আসতেন যে, "দুর গৌতম আর কী খেলবে? ওর খেলা, ফুসফুসের জোর সব ইস্টবেঙ্গল ছাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে।"

সব কানে আসত। রাগে ফুঁসতাম। কিন্তু উত্তর দিতাম না। কারণ আমি জানি, খেলোয়াড়ের উত্তর এক জায়গাতেই দেওয়া যায়। আর সেটা হল মাঠ। সেই জবাব দেওয়ার জন্য আরও জোর প্রস্তুতি শুরু করলাম। অনুশীলনের সময় বাড়ালাম। ফুটবল এমনই একটা খেলা—যত পরিশ্রম করা যায়, ফেরতও ঠিক ততটাই পাওয়া যায়। কিন্তু সাতদিন মাঠের বাইরে থাকলেই, যত বড় খেলোয়াড়ই হোক না কেন, মাঠে তাকে খুঁজে পাওয়াই মুশকিল হয়। তাই প্র্যাকটিসে কোনওরকম ঘাটতি দিতাম না।

লড়াই আমি করতে পারি, কিন্তু হারজিত তো আমার হাতে নয়। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই লিগে হারলাম এবং কী অপমানিতই না হলাম, তা আগেই বলেছি। যে ছেলেটি দু' দিন আগেও আমার দেওয়া ডে-স্লিপে খেলা দেখেছে, সেও আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে লাগল। সঙ্গে ছিল একমাত্র বাল্যবন্ধু অজিত। একটি লোকও যখন আমায় চিনত না, তখনও সে যেমন আমার সঙ্গে থাকত, যখন পরিচিতি পেয়েছি, তখনও সে পাশে ছিল, আমার অপমানের সময়ও পালায়নি। সৌভাগ্যের কথা, খেলা ছেড়ে দেওয়ার পরও অজিত আমায় ছাড়েনি। এই ধরনের বন্ধু পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা। কোনও কোনও অত্যুৎসাহী সমর্থক আবার আমার ওপর রাগ মেটাতে অজিতকে এক হাত নেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

যত এসব হতে লাগল, আমি তত দাঁতে দাঁত চাপতে লাগলাম। সুধীরকে বললাম, আমরা কি কিছুই খেলা শিখিনি? এর প্রতিটি জবাব মাঠে দেব। দিতে হবেই। পেলে এলেন ঠিক শিল্ডের আগে, কসমস ক্লাবের হয়ে খেলতে। ফুটবলের ঈশ্বরকে দেখিনি কিন্তু পেলেকে দেখার এবং তাঁর সঙ্গে খেলার সৌভাগ্যও হল। এ-লেখার শুরুতেই সে কথা জানিয়েছি। আমার জীবনের অন্যতম সেরা ঘটনা সেটা। আনন্দে বুক ভরে গেল, কিন্তু ক্ষতটা শুকোচ্ছে কই?

পেলের সঙ্গে ম্যাচের কয়েকদিন পরই ছিল শিল্ড ফাইনাল। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গেই। পেলের সঙ্গে খেলতে গিয়ে তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছিলাম, কিন্তু সেসব ভুলে গেলাম। পেলের সঙ্গে খেলার পরের দিন সকাল থেকেই আবার অনুশীলন। আমি ফুটবল খেলতে জানি, পেলে বলে গেছেন। কিন্তু আরও কাউকে কাউকে সে-কথাটা স্বীকার করাতেই হবে।

শিল্ড ফাইনালের দিন বাড়ি থেকে বাবা মাকে প্রণাম করে বেরনোর সময় কেন জানি না, মনে হচ্ছিল আজ জিতবই আমরা। অন্যায় একবার হয়, বারবার হয় না। জিতলাম, মোহনবাগান সব বিভাগে পরাস্ত করল ইস্টবেঙ্গলকে। হাবিব, শ্যাম, সুধীর দারুণ খেলল। প্রমাণ হল, সুধীর, গৌতম থাকলেও মোহনবাগান জিততে পারে, আমরা বিশ্বাসঘাতক নই। এতদিনে যেন অপমানের ক্ষতের ওপর একটা প্রলেপ পড়ল। তবে এও মনে হচ্ছিল, আজ যেসব সমর্থক আমাদের মাথায় তুলছেন, কয়েকদিন আগে তাঁদেরই কেউ কেউ আমাদের পায়ের তলায় পিষে ফেলতে চাইছিলেন। তবে হয়তো এটাই জীবনের নিয়ম!

শিল্ডের পর রোভার্স কাপ খেলতে বোম্বাইয়ে গেলাম। সেখানেও ইস্টবেঙ্গলকে হারালাম সেমিফাইনালে। আক্ষরিক অর্থে সেদিন আমরা ইস্টবেঙ্গলকে দাঁড়াতেই দিইনি। জিতলাম রোভার্সও। এলাম দিল্লিতে ডুরান্ড খেলতে। ইস্টবেঙ্গল খেললই না আমাদের সঙ্গে। জয় করলাম ত্রিমুকুট। অনন্য গৌরব, অনন্য সম্মান। আমার আনন্দ আরও বেশি। কারণ, ১৯৭২ সালে ইস্টবেঙ্গলের ত্রিমুকুট জয়েও আমি ছিলাম একজন অংশীদার। এবার মোহনবাগানের ত্রিমুকুট জয়েও আমি দলের অন্যতম সদস্য।

তবে, আমার সব আনন্দ ছাপিয়ে গেল এই ভেবে যে, জার্সি, দলবদল এ-সব কোনও ব্যাপারই নয়, এটা আমি প্রমাণ করতে পেরেছি। ফুটবলার শেষ কথা বলবে মাঠে এবং তার দুই অস্ত্র পা। ফুটবল যদি বশে থাকে কেউই তাকে আটকাতে পারবে না।

(ক্রমশ)

অনুলিখন : তানাজি সেনগুপ্ত

শিরোনামে উষা ও মঞ্জরেকর

অনুপম সরকার

শেষ হাসিটি তা হলে উষাই হাসলেন। সোল ওলিম্পিকে ব্যর্থতার পর অনেক অপমান, গঞ্জনা ও কটূক্তি শুনেও নিজেকে ট্র্যাক থেকে সরিয়ে নেননি। বরং দ্বিগুণ উৎসাহে অনুশীলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন পঁচিশ বছরের তরুণী উষা। অবশ্যম্ভাবী ফল হল এশিয়ান ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড মিটে। শুধু চারটি সোনাই নয়, মিটের সেরা অ্যাথলিটের সম্মানও পেয়েছেন তিনি। এশিয়ার সেরা যে, এ-বছর ভারতেরও সেরা অ্যাথলিট হবেন তাতে আর সন্দেহ কী! সত্যি বলতে কি, গত প্রায় এক দশক ধরেই উষা ছিলেন আমাদের একমাত্র আশা। আশির দশককে তিনি চিহ্নিত করে গেলেন 'উষার দশক' হিসেবে।

বাহাদুরপ্রসাদ দূরপাল্লার দৌড়ে সাফল্য পেলেও এ-বছর পুরুষদের মধ্যে আর কোনও ভারতীয় অ্যাথলিট তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। কয়েকজন বড়মাপের বিশ্বসেরা অ্যাথলেটকে অবশ্য দেখার সৌভাগ্য ভারতবাসীর হয়েছে। কার্ল লুইস, তাঁর বিখ্যাত দৌড় ক্লাব সেন্ট মোনিকার সদস্যরা, সৈয়দ আউইতা প্রমুখ আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে গেলেন দিল্লিতে। এঁদের দেখে কিছু যদি শিখতে পারেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা তা হলে আমরা উপকৃত হতে পারি।

ক্রিকেটে এ-বছর ঘটে গেল নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শততম টেস্ট খেললেন কপিলদেব, প্রবলবেগে এগিয়ে চলেছেন চারশো উইকেটের দিকে। শততম টেস্ট খেললেন উপমহাদেশের আর-এক ব্যাটসম্যানও জাভেদ মিয়াদাদ। শত টেস্টকে স্মরণীয় করে রাখলেন একটি শত রানের ইনিংস খেলেও, সঙ্গে-সঙ্গে একটি রেকর্ডও করলেন—জীবনের প্রথম এবং শত টেস্টে সেঞ্চুরির অনন্য গৌরব। আটহাজারী হলেন অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক বর্ডার এ-বছরই এবং অ্যাশেজ সিরিজে প্রায় উড়িয়েই দিলেন ইংল্যান্ডকে। মিনি বিশ্বকাপ, নেহরু কাপে রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে ট্রোফি ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন ইমরান খানের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান দল। খেলার জন্য না হোক, চমৎকার অনুষ্ঠান করার জন্য আমরা অবশ্যই গর্বিত হতে পারি। নেহরু কাপ, তার আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ভরাডুবি এবং

সেন্ট মোনিকা ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে কার্ল লুইস (ডান দিকে)

পাকিস্তানে তথৈবচ অবস্থার মধ্যে আমাদের একমাত্র আশার আলো শচীন তেণ্ডুলকর, সঞ্জয় মঞ্জরেকরের উঠে আসা। তবে দুঃখের কথা, পাকিস্তানে ইমরান যখন একের পর এক মিডিয়াম পেস বোলার তুলে আনছেন, তখন গত দশ বছরেও আমরা কপিলদেবের পর আর একজনও তৈরি করতে পারলাম না।

তিন বঙ্গকন্যা বাংলার মান রেখেছেন। সুমিতা লাহা পাওয়ার লিফটিং-এ বিশ্বরেকর্ড

বিজয়িনী উষা

গড়লেন, বুলা চৌধুরী পেরিয়ে এলেন ইংলিশ চ্যানেল আর কবিতা গড়াড়ী রুপো পেলেন এশিয়ান মিটে। কলকাতা তথা ভারতীয় ফুটবল শুধু লজ্জিতই করে গেল এ-বছর। বিশ্ব-ফুটবলে অবশ্য এ-বছরটা গেল প্রস্তুতির জন্য—বিশ্বকাপ-ফুটবলের চরম প্রস্তুতির আগে শেষ হল কোয়ালিফাইং রাউন্ড। আর কয়েক মাসের মধ্যেই মারাদোনা, গুলিট, বাস্তেন, বর্গিদের চরম 'খেলা' ইতালিতে।

মহিলা টেনিসে এখন স্টেফি গ্রাফের যুগ। উইম্বল্ডন, অস্ট্রেলীয় এবং ইউ· এস· ওপেন জয়েই শুধু নয়, সার্বিক দক্ষতাতেই গ্রাফ এখন শীর্ষে। 'শিল্পী' ক্রিস এভার্টের অবসরের পর মার্টিনা নাভ্রাতিলোভাই এখন তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। অবশ্য দ্রুত উঠে আসছেন কিছু প্রতিভাময়ী খেলোয়াড়ও। বিশ্বে এক নম্বর পুরুষ টেনিস তারকা ইভান লেন্ডল এবারও পারলেন না উইম্বল্ডন জিততে, বরিস বেকার পুনরায় সম্মান ছিনিয়ে নিলেন। ফরাসি ওপেন বিজেতা তরুণ মাইকেল চ্যাং বছরটা শুরু ভাল করলেও শেষটা খুব একটা ভাল করেননি।

অবশ্য সব তরুণ-তরুণী খেলোয়াড়ের সামনেই এখন প্রচুর সুযোগ, কয়েকদিন পরই শুরু হচ্ছে নতুন বছর, নতুন দশক। সুতরাং আশা দিয়েই শুরু হোক নব্বইয়ের দশক।

ফোটো : উৎপল সরকার

উদাসী রাজকুমার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে উঁচু বেদীটার কাছে চলে এল চম্পক। তার মুখ খুশিতে ঝলমল করছে। প্রজাদের চিৎকারকে সে মনে করছে তার নামে জয়ধ্বনি! ঘোড়া থেকে নেমে দু' হাত জোড় করে সে বলল, "প্রণাম, গুরুদেব!"

ছন্তী পেছন ফিরে সেনাবাহিনীর দিকে একটা হাত তুলে ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে এই রাজ্যের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী বাহিনী ছুটে গিয়ে দাঁড়াল চম্পকের পাহাড়ি সৈন্যদের মুখোমুখি। তাদের প্রত্যেকের হাতে উদ্যত বর্শা।

আর চারজন বিশালদেহী প্রহরী ঘিরে ধরল চম্পককে।

ছন্তী চম্পককে অগ্রাহ্য করে তাকিয়ে রইলেন দূরের দিকে। মহারানি তলতাদেবীর ঘোড়াটা তীরের মতন ছুটে যাচ্ছে, আর দু'জন ঘোড়সওয়ার অনুসরণ করছে তাঁকে।

ছন্তী চেঁচিয়ে বললেন, "ধরো ওকে! কিছুতেই যেন পালাতে না পারে।"

এতক্ষণে রাজকুমার তীক্ষ্ণর ঠোঁট কেঁপে উঠল। সে ব্যাকুল ভাবে ডেকে উঠল, "মা, মা!"

ছন্তী কোমল গলায় বললেন, "দ্যাখো কুমার, তোমার মা পালিয়ে যাচ্ছেন!"

তীক্ষ্ণ ছলছল চোখ তুলে বলল, "কেন? মা চলে যাচ্ছেন কেন?"

ছন্তী বললেন, "ভয় পেয়েছেন। তোমার বাবাকে তোমার মা মেরে ফেলেছেন তো! আমরা যে সব জেনে গেছি তা বুঝতে পেরে পালিয়ে যাচ্ছেন।"

তীক্ষ্ণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমার বাবাকে আমার মা মারবেন কেন?"

ছন্তী বললেন, "লোভ, লোভ, বুঝলে কুমার, লোভের জন্য মানুষ কত না অন্যায় করে!"

বেদীতলা থেকে চম্পক অধৈর্যভাবে বলে উঠল, "এ কী, গুরুদেব। এই প্রহরীগুলো আমাকে ওপরে উঠতে দিচ্ছে না কেন?"

এবার ছন্তী চম্পকের দিকে তাকিয়ে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "বিশ্বাসঘাতক! দেশদ্রোহী! ঘৃণ্য কুক্কুর! তুই সিংহাসনের লোভে আমাদের প্রিয় রাজাকে হত্যা করেছিস!"

চম্পক চোখ কপালে তুলে বলল, "এ কী বলছেন, গুরুদেব? আপনার সঙ্গে আমার যে কথা...."

ছন্তী ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রহরীদের বললেন, "ওকে কোনও কথা বলতে দিও না। ওর মুখ বাঁধো। হাত বাঁধো!"

প্রায় নিমেষের মধ্যেই চম্পকের মুখ আর হাত বেঁধে দেওয়া হল। তবু সে কিছু বলার চেষ্টায় গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগল প্রাণপণে।

ছন্তী আবার বললেন, "তোর মতন বিশ্বাসঘাতককে যদি রাজধানীর নাগরিকদের হাতে তুলে দিই, তা হলে তারা তোকে এই মুহূর্তে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে!"

প্রজারা চেঁচিয়ে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন!"

কয়েকজন প্রহরীদের ঠেলে চম্পকের চুলের মুঠি চেপে ধরবার চেষ্টা করল।

ছন্তী তাদের নিষেধ করে বললেন, "তোমরা ছেড়ে দাও! এখানে আমি রক্তপাত চাই না। প্রহরীরা ওকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও! এই দণ্ডেই ওকে শূলে চড়াও। সাবধান, ওর মুখের বাঁধন যেন খুলে না যায়। ওর আর একটা কথাও শোনা পাপ! এ-রাজ্যের ইতিহাস থেকে ওর নাম মুছে দেওয়া হবে!"

প্রহরীরা টানতে টানতে নিয়ে গেল চম্পককে। সে তখনও গোঁ গোঁ শব্দ করে অনেক কিছু বলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু তার কোনও কথাই বোঝা গেল না।

ছন্তী আবার প্রজাদের গোলমাল থামাবার ইঙ্গিত করে বললেন, "আর একজন ষড়যন্ত্রকারী তলতাদেবীও পালাতে পারবে না বেশিদূর, ধরা সে পড়বেই। তার শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড!"

প্রজারা সবাই হতবাক হয়ে রইল। মহারানিকে তারা সবাই ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। সেই মহারানি বিশ্বাসঘাতকতা করে মহারাজকে হত্যা করেছে, এ-কথা এখনও যেন তারা বিশ্বাস করতে পারছে না। তবু ছন্তীর কথায় কেউ প্রতিবাদ করল না। কারণ, মহারাজ নিহত হয়েছেন একথা ঠিক। এবং বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি তো মৃত্যুদণ্ড বটেই।

ছন্তী বললেন, "মহারানির মৃত্যুদণ্ডই যোগ্য শাস্তি, কিন্তু সে শাস্তি তাকে দেওয়া হবে না। নারী অবধ্য। নারীর প্রাণদণ্ড দিলে রাজ্যের অকল্যাণ হয়। সেইজন্য প্রাণদণ্ডের বদলে তলতাদেবীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হল। ধরা পড়ার পর থেকে ওই বিশ্বাসঘাতিনী তলতাদেবীকে সারাজীবন কালাঘরে বন্দিনী থাকতে হবে!"

তলতাদেবীর এই শাস্তিতে প্রজারা যেন সকলেই খুশি হয়ে উঠল। বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে যে মহারানির মুণ্ডু কেটে ফেলা হবে না, এটাই যথেষ্ট। কালাঘরে থাকলেও তিনি বেঁচেই তো থাকবেন।

ছন্তীর সুবিচারে প্রজারা চেঁচিয়ে বলে উঠল, "জয় গুরুদেব ছন্তীর জয়!"

ছন্তী বললেন, "শোনো, শোনো, এখন উচ্ছ্বাসের সময় নয়। এখন বিপদের সময়। এই মুহূর্তে এ-রাজ্যে কোনও রাজা নেই। রাজা ছাড়া কোনও রাজ্য টিকতে পারে না। যে-কোনও মুহূর্তে শত্রু এসে আক্রমণ করতে পারে। এক্ষুনি রাজা নিয়োগ করা দরকার। রাজসিংহাসনে কে বসবে? কে? কে? কে?"

সবাই একসঙ্গে জানাল, "আপনি? আপনি? আপনি!"

ছন্তী দু' হাত নাড়তে লাগলেন। প্রজারা আবার চুপ করলে তিনি বললেন, "না, আমি রাজা হব না! আমি পুরোহিত। আমি সন্ন্যাসী! আমি কোনওদিনও রাজা হতে চাই না। সিংহাসনের ওপর আমার কোনও লোভ নেই। এই গৌরবময় রাজ্যের সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী মহান রাজা মহাচূড়ামণির পুত্রেরা। সেইজন্যই আমি রাজকুমার তীক্ষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। সে বয়েসে অতি বালক হলেও নিজের চোখে সবকিছু দেখল। সে জানল যে, চম্পকের সঙ্গে

ষড়যন্ত্র করে তার মা হত্যা করেছেন মহারাজকে।এই পাপীয়সী মাকে সে কি আর কোনওদিন শ্রদ্ধা করতে পারবে ?"

ছন্তী এবার নিচু হয়ে তুলে নিলেন মহাচূড়ামণির রাজমুকুট এবং বিখ্যাত তলোয়ার। সে দুটি প্রজাদের দেখিয়ে বললেন, "এই দ্যাখো, মহারাজ এগুলো বিশ্বাস করে আমার কাছে রেখে গিয়েছিলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা যখন মহারাজ মহাচূড়ামণিকে ভুলিয়ে রাজধানীর বাইরে নিয়ে যায়, সেই সময় তিনি নিশ্চয়ই কিছু সন্দেহ করেছিলেন। তিনি আমায় বলেছিলেন, গুরুদেব, দৈবাৎ যদি আমার কোনও বিপদ ঘটে, আপনার ওপর ভার দিয়ে গেলাম, আপনি রাজ্য রক্ষা করবেন। আমার সন্তানদের আপনি দেখবেন, তাদের যেন কোনও বিপদ না ঘটে ! এই গুরুদায়িত্ব আমি স্কন্ধে নিয়েছি। এই দায়িত্ব আমি আজীবন পালন করে যাব। এই রাজমুকুট আমি পরিয়ে দিচ্ছি কুমার তীক্ষ্ণ'র মাথায়। এই হিরণ্যক তলোয়ার আমি তুলে দিচ্ছি তার হাতে। আজ থেকে তীক্ষ্ণই রাজা।"

প্রজারা প্রবল উল্লাসে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। রাজপুরোহিতের বদলে যে রাজকুমারই রাজা হলেন, এটাই যেন বেশি ভাল হল। সবাই খুশি। শুধু কয়েকজনের মনে প্রশ্ন জাগল, দুই রাজকুমারের মধ্যে দৃঢ়ই তো বয়েসে বড়, সুতরাং তারই তো রাজা হওয়া উচিত ছিল ! কিন্তু দৃঢ় কোথায় ? ছন্তী বড় রাজকুমার দৃঢ়র কথা একবারও বললেন না কেন ?

এই প্রশ্ন কয়েকজনের মনে জাগলেও তারা এখন উচ্চারণ করতে সাহস করল না। ছন্তী কত বড় আত্মত্যাগী, তিনি ইচ্ছে করলেই সিংহাসনে বসতে পারতেন, তবু তা ছেড়ে দিলেন। তিনি যে ছোটকুমার তীক্ষ্ণকে রাজা করলেন, তা নিশ্চয়ই বিশেষ কোনও কারণে ভেবেচিন্তেই করেছেন !

বালক তীক্ষ্ণর মাথায় একটা মস্ত বড় রাজমুকুট। তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, ঠোঁট দুটি কাঁপছে। সে যেন কোনও কথাই শুনছে না, সে শুধু ভাবছে তার মায়ের কথা।

ছন্তী তীক্ষ্ণর মাথার কাছে হাত এনে আশীর্বাদ করলেন। তারপর প্রজাদের বললেন, "এই খুদে রাজা যতদিন সাবালক হয়ে না ওঠে, ততদিন এর হয়ে আমিই রাজ্যের সব কাজ দেখাশুনো করব। আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি, আমি নিজে এই তীক্ষ্ণকে সবরকম শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেব। সবদিক থেকেই এই কুমার হবে অপরাজেয়। ষোলো বছর বয়েস হলেই তীক্ষ্ণ মহারাজের বেশে সিংহাসনে বসবে !"

এর পর প্রজাদের আনন্দের মাতামাতি চলল বেশ অনেকক্ষণ ধরে।

এক সময় ছন্তী তীক্ষ্ণর হাত ধরে নেমে এলেন বেদী থেকে। নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "খিদে পেয়েছে, তাই না ? সকাল থেকে কিছুই তো খাওয়া হয়নি !"

তীক্ষ্ণ দু' দিকে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল যে তার খিদে পায়নি !

ছন্তী বললেন, "তৃষ্ণায় আমার গলা শুকিয়ে গেছে। বহুক্ষণ চিৎকার করেছি। চলো, এখন প্রাসাদে যাই !"

কাছেই অপেক্ষা করছে একটি সোনার ঝালর দেওয়া পালকি। মহারানি তলতাদেবী মন্দিরে যাবার সময় এই পালকি ব্যবহার করতেন কখনও-কখনও। ছন্তী সেই পালকিতে তীক্ষ্ণকে নিয়ে উঠে বাহকদের বললেন, "শীঘ্র রাজপ্রাসাদে চলো !"

রাজপ্রাসাদের রক্ষীরা এর মধ্যেই জেনে গেছে যে, তীক্ষ্ণ'র নাম রাজা বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ছন্তীই রাজ্যের সব কিছু চালাবেন, তাঁর হাতেই সমস্ত ক্ষমতা।

রক্ষীরা ছন্তীর সামনে হাত জোড় করে দাঁড়াল।

ছন্তী বললেন, "সেনানায়ক ভামহকে খবর পাঠাও, সে যেন এখানে আমার জন্য অপেক্ষা করে এক দণ্ড পরে। আমি ওপর থেকে আসছি !"

তীক্ষ্ণকে নিয়ে প্রাসাদের দ্বিতলে উঠে এলেন ছন্তী। এর মধ্যেই সেখানকার অনেক বদল ঘটে গেছে। সব ঘর খালি। লম্বা অলিন্দের মাঝখানে উঠেছে একটা নতুন দেওয়াল, সেখানে একটা সুবিশাল লৌহদ্বার।

সেই দ্বার দিয়ে ঢোকার আগে তীক্ষ্ণ একটু দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "আমার মা কোথায় ?"

ছন্তী বললেন, "এখনও ধরা পড়েননি, তবে ধরা পড়বেন নিশ্চয়ই। কুমার তীক্ষ্ণ, তুমি সারাজীবনে আর তোমার মাকে দেখতে পাবে না।"

তীক্ষ্ণ আবার জিজ্ঞেস করল, "আমার দাদা কোথায় ?"

ছন্তী বললেন, "তোমার দাদা দৃঢ়কেও তুমি কখনও দেখতে পাবে না। প্রাসাদের এই অংশে শুধু তুমি আর আমি থাকব। মনে করো, তোমার মা, দাদা, এরা আর কেউ নেই। তোমার জন্য শুধু আমি আছি। এখন থেকে তুমি আমাকেই বাবা বলে ডাকবে।"

(ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

আপনার নির্ভরযোগ্য ফ্যারেক্স,
এখন স্বাদে সবার সেরা!

আপনার বাচ্চা চার মাসের হলে, তাকে
নতুন স্বাদভরা ফ্যারেক্স খাওয়াতে শুরু করুন।
প্রথমে ১ চা-চামচ ফ্যারেক্সে ৩-৪ চা-চামচ
অল্প-গরম জল মিশিয়ে খাওয়ান। ফ্যারেক্স
এখন আগের থেকে বেশী মুখরোচক
আর বেশী পুষ্টিকরও!

• বেশী মুখরোচক
• বেশী পুষ্টিকর

ফ্যারেক্স® -বেড়ে ওঠার এক স্বাদভরা উপায়!

GX/65/244 BEN

রায়গঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

দুই শিক্ষানুরাগী সমাজসেবী কুলচন্দ্র গুহ এবং কুলচন্দ্র মিত্র রায়গঞ্জের মতো একটি ছোট শহরে মেয়েদের শিক্ষার অব্যবস্থার কথা চিন্তাভাবনা করে ১৯৩৩ সালে দুটি টিনের ঘর নিয়ে 'সরোজিনী মধ্য ইংরাজি বালিকা বিদ্যালয়' নামে যে স্কুলটির প্রতিষ্ঠা করেন সেই স্কুলটিই অনেক পরিবর্তন আর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আজ রায়গঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় নামে চিহ্নিত। যে-সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তখন শিক্ষার অগ্রগতি বলতে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলায় মাত্র ক'টি উচ্চ বিদ্যালয়। আর শুধুমাত্র মেয়েদের স্কুল সারা জেলায় একটি—সেটিও আবার দিনাজপুর সদর শহরে। দিনাজপুর শহরে বাইরের মেয়েদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে বিরাট বাধা ছিল, ছিল না আজকের মতো যোগাযোগ ব্যবস্থা। মেয়েদের থাকার জন্য কোনও হস্টেলও ছিল না। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই সরোজিনী মধ্য ইংরাজি বালিকা বিদ্যালয় ওই সময় এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে এক নতুন উদ্দীপনার সূচনা করে।

প্রধানশিক্ষিকা

স্কুলটি প্রথম অবস্থায় বেশ ক' বছর মাইনর স্কুল হিসেবে চলে। তখন তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হত। ১৯৩৬-এ স্কুলের নিজস্ব জমিতে ছ'টি টিনের চালাঘর দিয়ে পাকাপোক্তভাবে স্কুল-বাড়ির কাজ শুরু হয়। এভাবে চলতে থাকে বেশ ক' বছর।
ইতিমধ্যে স্কুলের নামডাকও ছড়িয়ে পড়ে, দূর থেকেও মেয়েরা পড়তে আসে। এইরকম সময় ১৯৪৭-এ স্কুলটি জুনিয়ার হাই স্কুলে উন্নীত হয়। ১৯৫০-এ হাই স্কুল হিসেবে চালু হয়, অনুমোদন লাভ করে ১৯৫২ সালে। হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল হিসেবে অনুমোদন পায় ১৯৬১-তে।
পড়াশোনা, খেলাধুলো, সাংস্কৃতিক চর্চা, নিয়মানুবর্তিতা সব দিক দিয়েই এই স্কুল

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার মধ্যে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে।
বর্তমান প্রধানশিক্ষিকা সুধা দত্তচৌধুরী স্কুলে দীর্ঘকাল ধরে আছেন। ১৯৫২ সালে ওই স্কুলের প্রথম ম্যাট্রিক পরীক্ষার ব্যাচে তিনিও পরীক্ষার্থী ছিলেন। ১৯৫৪ সালে স্কুলে ঢোকেন একজন সহ-শিক্ষিকা হিসেবে, তারপর আর স্কুল ছাড়ার কথা ভাবেননি কখনও। অনেক ভাল চাকরির সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও এই স্কুলটিকে ছেড়ে যেতে পারেননি। তাঁর নিজের ভালমন্দের মধ্যেও যেন এই স্কুল অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। কথা প্রসঙ্গে প্রধানশিক্ষিকা সুধা দত্তচৌধুরী জানালেন, "এই স্কুল সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে অনেকের কথাই বলতে হয়, যেমন রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক, আমাদের মাস্টারমশাই শশীন্দ্রচন্দ্র দে'র নাম। তাঁর সাহায্য না পেলে হাই স্কুল হিসেবে অনুমোদন পেতে আমাদের অনেক দেরি হত। ১৯৫১-'৫২ সালে করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয়ের অনেক প্রবীন শিক্ষক আমাদের নিয়মিত ক্লাস নিতেন বিনা পারিশ্রমিকে। করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘরে আমরা বছর-দুয়েক নিয়মিত ক্লাসও করেছি। তখন এই স্কুল-বাড়ি হয়নি। নিয়মশৃঙ্খলা নিয়ে আমাদের স্কুলের অতীতেও যেমন সুনাম ছিল, এখনও আছে। স্কুলের নিজস্ব একটি নিয়ম আছে, এই নিয়মের উর্ধ্বে কেউ নয়। ক্লাস একবার শুরু হলে কাউকে বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। প্রার্থনার পর বিশেষ কারণ দেখাতে না পারলে কাউকে স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হয় না। স্কুল বসে ১১টায়। আমাদের স্কুলের মেয়েরা একাধিকবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।" রায়গঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী-সংখ্যা প্রায় এখন ১৫০০। শিক্ষিকা আছেন ৩৬ এবং অশিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা ৮ জন। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণীতে চারটি করে বিভাগ আছে, যেমন এ, বি, সি, ডি। এই চারটি বিভাগকে আবার ভাল-মন্দ ছাত্রীর নিরিখে সাজানো হয়।
স্কুলে একটি লাইব্রেরিও আছে। বইপত্রের সংখ্যাও ভাল। গ্রন্থাগারিক মালবিকা কুণ্ডু জানালেন, "ছাত্রীদের মধ্যে ছোটদের বই, কল্পবিজ্ঞান, জীবনীগ্রন্থের চাহিদাই বেশি।" খেলাধুলো সম্পর্কে বলতে গিয়ে সহকারী শিক্ষিকা কল্পনা চন্দ ও জয়া বর্মন জানালেন, "আমাদের স্কুলের মেয়েরা খেলাধুলোয় বরাবরই রায়গঞ্জ মহকুমায় শীর্ষস্থান দখল করে আছে। অসুবিধে একটাই, তা হল, আমাদের নিজস্ব মাঠ নেই। স্কুলের ভেতর যে ছোট্ট মাঠটি রয়েছে ওতেই আমরা অনেক অসুবিধে আর কষ্টের মধ্যে দিয়ে মেয়েদের খেলাধুলোর ব্যবস্থা করি। এই স্কুলেরই অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী রুপা দত্ত যোগাসনে দেশের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বহু পুরস্কার পেয়েছে।"
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পর্কে সহকারী-শিক্ষিকা রত্না রায় জানালেন, "সারা বছর ধরে কোনও-না-কোনও অনুষ্ঠান আমাদের স্কুলে লেগেই আছে, তার মধ্যে সবার নজর পড়ে 'প্রাইজ ডে' অনুষ্ঠানটি। স্কুলের মেয়েরা নাটকও করে। আবৃত্তিতে শ্রীপর্ণা দত্ত ও চন্দ্রিমা দত্ত এই অঞ্চলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম। বাইরের নানা অনুষ্ঠানেও এরা আবৃত্তিতে অংশ নেয়। নৃত্যে রাখী দে, কাকলি সরকার। সঙ্গীতে মৌসুমী মুখোপাধ্যায়, সুকন্যা রায় প্রমুখ ছাত্রীর নামও উল্লেখযোগ্য।" স্কুলে একটি ছাত্রীনিবাসও আছে।
এই স্কুলেরই ঘর, চেয়ার-টেবিল নিয়ে সকালের দিকে আর-একটি স্কুল হয়। সেটিও মেয়েদের স্কুল, নাম রায়গঞ্জ টেন ক্লাস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। তা ছাড়া আর একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় তো আছেই। প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়ার ব্যাপারে ইংরেজির শিক্ষিকা পারমিতা সেনগুপ্ত আর রমা রায়কে প্রশ্ন করাতে জানালেন, "প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়া মোটেও উচিত হয়নি, এতে উঁচু ক্লাসে মেয়েদের ভীষণ অসুবিধে দেখা দিচ্ছে।"
বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষিকা সুপর্ণা ভট্টাচার্য ও উজ্জয়িনী দাস জানালেন, "আমাদের স্কুলের মেয়েরা বরাবরই বিজ্ঞান বিভাগে ভাল ফল করে এসেছে। এবারও আশা করছি ১২-১৩ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগে পাশ করবে।"
সবশেষে প্রধানশিক্ষিকা সুধা দত্তচৌধুরী জানালেন, "১৯৫৪ সাল থেকে এই স্কুলে আছি, প্রধানশিক্ষিকার দায়িত্ব নিয়ে আছি বছর-দশেক। হাজার অসুবিধে হলেও বলব এখন কোনও অসুবিধে নেই। সমস্যা আছে ঠিকই, যেমন—ছাত্রী সংখ্যা দিন-দিন যেভাবে বাড়ছে, আরও দু-চারখানা ঘর দরকার। এত বড় স্কুল-বাড়ি,এর মেরামতির জন্য বাৎসরিক যদি কিছু টাকা পাওয়া যেত ভাল হত।"
মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য একদিন মাত্র দু'খানা ঘর নিয়ে যে স্কুলের জন্ম, আজ সেই স্কুল উত্তরোত্তর সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

নীরদ রায়

ফোটো : অলক কুণ্ডু

দশম শ্রেণীর প্রথম ছাত্রী

একটু নির্জনতা ভাল লাগে। অনর্থক চিৎকার-চেঁচামেচি, হুল্লোড় একদম পছন্দ নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত ভীষণ প্রিয়, নিজে নিয়মিত গানের শিক্ষকের কাছে শেখে। অকপটে কথাগুলি বলে ফেলে শর্মিষ্ঠা ঘোষ রায়গঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর প্রথম ছাত্রী। বার্ষিক পরীক্ষায় মোট ৬৭২ নম্বর পেয়ে নবম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উঠেছে। বাড়িতে সে দিনে ছ-সাত ঘণ্টা পড়াশোনা করে।
শর্মিষ্ঠা দু'জন মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ে। বাড়িতে বিজ্ঞান গ্রুপে তাকে সাহায্য করেন তার বাবা আর ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপে সাহায্য করেন মা। বাবা মৃন্ময় ঘোষও পড়াশোনায় একসময় খুব ভাল ছাত্র ছিলেন, এখন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া রায়গঞ্জ শাখার একজন পদস্থ কর্মচারী। মেয়েকে এঞ্জিনিয়ার করার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু শর্মিষ্ঠার ইচ্ছে সে চিকিৎসক হবে। মানুষের সেবা করবে। ক্লাসে শর্মিষ্ঠার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী বনশ্রী ভৌমিক। তার

শর্মিষ্ঠা ঘোষ

প্রিয় লেখক বিমল কর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রিয় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। শর্মিষ্ঠা নিজে কবিতাও লেখে। ক্রিকেট তার সবচেয়ে প্রিয় খেলা। টিভিতে খেলা থাকলে সেদিন স্নান-খাওয়া ভুলে যায়। প্রিয় ক্রিকেটার কপিলদেব, বথাম, ভিভ রিচার্ডস, মিয়াঁদাদ। টিভির সব অনুষ্ঠান তাকে টানে না, 'মহাভারত' তার খুব ভাল লাগে।

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
টম কিনসায়েড তাঁর খুদে ডুবোজাহাজে জলের তলায় গুহার মধ্যে গিয়ে পৌঁছল। ভূমিকম্পে গুহার ছাদ ভেঙে পড়বার আগেই সে ফোনেসিয়ার সোনা নিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতে চায় ...
বিস্‌লি, ওই যে ফোনেসিয়ার সোনা । এখান থেকে প্রাণে বেঁচে ফিরতে পারলে এ-সবই তোমার !
তা হলে তো তাড়াতাড়ি হাত চালানোই উচিত, তাই না টমাস ?
তোমরা সবাই হাত লাগাও !
মাটি কাঁপছে, বুঝতে পারছ, আর্থার ? এক্ষুনি হয়তো ছাদ ভেঙে পড়বে !
টমাস, তোমার কাজ সবটুকু সোনা ডুবোজাহাজে তুলে দেওয়া ! কখন যেতে হবে বলে দেব আমি।
গুড়ড়ড়
এই মুহূর্তেই চলে যাওয়া উচিত !
সব সোনা তুলে নেবার আগে নয়, বুঝেছ ? !
গুড়ড়ড় !
কিনসায়েড, ওই বাটগুলি তুলে নাও, নইলে মরবে !
না !
বেওকুফ ! তোমার জন্যেই আমাদের মাথার ওপর ছাদ ভেঙে পড়ল !

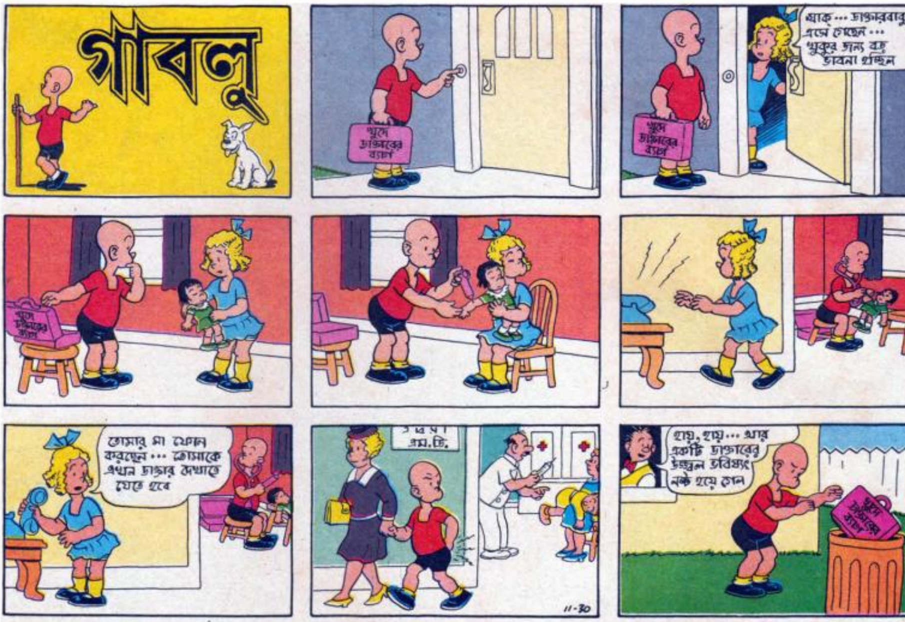
গাবলু
খুদে ডাক্তারের বাক্স
যাক্ ... ডাক্তারবাবু এসে গেছেন ... খুকুর জন্য বড় ভাবনা হচ্ছিল
তোমার মা ফোন করছেন ... তোমাকে এখন ডাক্তার দেখাতে যেতে হবে
হায়, হায় ... আর একটি ডাক্তারের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে গেল

গাবলু
গত বছর সারস যে-বাচ্চাটি এনেছে তাকে সঙ্গে নিয়ে তোমার কাকিমা বেড়াতে আসছেন
সারস
আমরা বাজারে গেলে গাবলু আনন্দে খোকার দেখাশোনা করবে
সারসের উপহার আমার ছোট্ট সোনা লক্ষী ছেলে হয়ে ছিল তো?
আমাদের দাবি দ্রব্য নিয়ন্ত্রন
সারস

প্রতিবন্ধী হরিণ

দেবব্রত মৈত্র

যখন ও নিতান্তই ছোট, সেই সময় ঝরনার ধারে একটা বড় পাথর থেকে আর-একটা বড় পাথরে লাফাতে গিয়ে ওর পেছনের বাঁ পা'টা গিয়েছিল ভেঙে। তারপর থেকে ও হাঁটত তিন পায়ে, খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে। ছুটতে পারত না, খেলতে পারত না, এমনকী বেশিক্ষণ একনাগাড়ে হাঁটতেও পারত না।

বহুদিন ধরে ব্যবহার না করার ফলে ভাঙা পা'টা হয়ে পড়েছিল সরু আর ছোট। বসে থাকতে-থাকতে ঘাড় ঘুরিয়ে সেই পা'টা দেখত ও মাঝে-মাঝে। পা'টার ওপর কখনও ওর খুব রাগ হত, সেটাকে আছড়াত ও গাছের গুঁড়িতে। আবার কখনও বা মায়া হত। জিভ দিয়ে চেটে-চেটে আদর করত ভাঙা পা'টাকে।

মোটা-মোটা লতা আর বড়-বড় গাছ ঘেরা সুন্দর বাসাটাতেই বসে থাকত চুপচাপ। আর ভাবত। এই ভাবেই হয়ে পড়েছিল ও ভাবুক।

যতদিন ওর মা ছিল তেমন কিছু অসুবিধে হত না। মার সঙ্গে ভোরবেলায় বাসার পেছন দিকের ঝোপের মধ্যে দিয়ে ঝরনার ধারের ছোট সমতল চৌকো জায়গাটায় যেত। সেখানে বড়-বড় রসাল একধরনের তাজা ঘাস জন্মায়। ওরা দু'জন ঘুরে-ঘুরে খেত। তারপর ঝরনায় জল খেয়ে বাসায় ফিরত। অবশ্য সেখানে যা ঘাস হত তাতে তাদের দু'জনের প্রতিদিনের খাওয়া হত না। তাই তার মা তাকে বাসায় রেখে দূরে-দূরে গিয়ে নানারকম ঘাস-পাতা, মূল এমনকী ফলও নিয়ে আসত।

কিন্তু এখন তাকে তার খাবার নিজেকেই জোগাড় করতে হয়। আবার খাবার জোগাড় করতে বাসা থেকে বেরিয়ে অজানা দিকে যেতেও তার সাহস হয় না। একে তো তিন পায়ে লেংচে-লেংচে চলতে হয়। তায় অন্যান্য তৃণভোজী জন্তুদের ভাগে ভাগ বসাতে গেলে লড়াই বাঁধা সম্ভব, যা ওর পক্ষে খুবই ভয়ের। তার ওপরে আছে সেইসব জন্তু, যারা তৃণভোজী প্রাণী হত্যা করে এবং খায়। যাদের সে চোখে দেখেনি কোনওদিন। কিন্তু মার কাছে অনেক গল্প শুনেছে। আর সবার ওপরে আছে সেই বিভীষিকা। ভাবতে গেলে এখনও গায়ে কাঁপুনি লাগে।

ওর মনে পড়ে সেই দিনের কথা, যেদিন ঝরনার ধারে জল খেতে যাওয়ার সময় হঠাৎ মায়ের আর্ত চিৎকারে ও পেছন ফিরে তাকিয়েছিল আর দেখেছিল একটা মর্মান্তিক দৃশ্য। একটি বিশাল মোটা লতার মতো জন্তু মার শরীরটা পাকে-পাকে জড়িয়ে ধরেছে। ও বুঝতে পেরেছিল, এই সেই সাঙ্ঘাতিক ময়াল, যার কথা মা তাকে অনেকবার বলেছিল।

আর সকলের মার মতো ওর মা ওর কাছে শুধু মা-ই ছিল না। ছিল বন্ধু, খাদ্য সরবরাহকারী, খেলার সঙ্গী। মাকে হারিয়ে কী অসহায় যে হয়ে পড়েছে ও!

চুপচাপ বসে থাকা আর দিনে তিন-চার বার ঝরনার ধারে গিয়ে ঘাস খাওয়া বা জল খাওয়া কিংবা বিরাট নুন-পাথরটা চেটে আসা।

একটা সুবিধে আছে। ওখানে যে ঘাস হয় তা খেয়ে নিলেও দ্রুত জন্মায়। তা ছাড়া, ও খেলে না, ছোটে না, কোনও রকম পরিশ্রম করে না বলে খিদে কম পায় আর খায়ও কম। তাই খাবারের অভাব হয় না।

একটা অসুবিধেও আছে। রোজ একই খাবার খেতে হয়। এটা এত বিশ্রী লাগে যে মাঝে-মাঝে ওর মনে হয়, বেরিয়ে পড়ে গণ্ডির বাইরে। এই বিশাল জঙ্গলের নানা জায়গায় ঘুরে বিভিন্নরকম খাবার খেয়ে আর সব কিছু দেখে বাঁচার মতো বাঁচতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু ও জানে তা হওয়ার নয়। তিনটে পা নিয়ে জগতে সুখী হওয়া যায় না।

সেদিনও ও বাসার বাইরে এসে একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে-বসে নানারকম ভাবছিল। এমন সময় দুটো বাচ্চা হরিণ দেখতে পেল। মাঝে-মাঝে হরিণ ও দেখতে পায়। আরও কিছু ছোট্টখাট্টো জন্তু— যেমন খরগোশ, বেজি, কাঠবেড়ালি, ইঁদুর, বাঁদর, সজারু ইত্যাদিও প্রচুর দেখে। ছোটখাটো সাপ, পাখি দেখে। কয়েকবার শেয়ালও দেখেছে। ভাম, বনবেড়ালও দেখেছে। একবার কয়েকটা বুনো মোষও দেখেছিল। আর-একবার দেখেছিল বুনো দাঁতাল শুয়োর।

বাচ্চা দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল ও।

দুজনেরই বেশ চমৎকার স্বাস্থ্য। দুজনেই চঞ্চল।

বাচ্চা দুটো ধীরে-ধীরে ওর কাছে এল। একটু ঘুরল-ফিরল। বসল। গায়ে গা ঘষল। তারপর আপন খেয়ালে লাফাতে-লাফাতে কোথায় চলে গেল।

কয়েকদিন পর বাচ্চা দুটো আবার এল। একটু বেশিক্ষণ ওর কাছে থাকল সেদিন ওরা।

তারপর থেকে ওরা প্রায় রোজই আসতে লাগল। কোনও-কোনওদিন দু-তিনবারও এল। ওর ভালই লাগল।

একদিন ও খেতে যাচ্ছে এমন সময় এল ওরা। ওর পেছন-পেছন গেল। ওরকম সুন্দর ঘাস দেখে মহা আনন্দে খেল।

দেখতে ছোট্ট হলে কী হবে, বাচ্চা দুটো ছিল রাক্ষস। একদিনেই খেয়ে নিল ওর তিনদিনের খাবার।

ও চিন্তিত হল।

আরও চিন্তিত হল পরদিন, যখন বাচ্চা দুটোকে ওর সামনে দিয়েই লাফাতে লাফাতে এই জমিটার দিকে যেতে দেখল।

ও-ও তখন পেছন-পেছন গেল। খেতে-খেতে ভাবতে লাগল এ আবার কী বিপদ এল। খাবার ফুরোলে যাবে কোথায়?

এর ওপর আবার এক নতুন বিপদ শুরু হল। হঠাৎ ছুটে আসা একটা বাচ্চার সঙ্গে ধাক্কা লেগে যেতে ও ধপাস করে পড়ে গিয়েছিল। একে খাচ্ছিল বলে ছিল অন্যমনস্ক, তায় তিন পায়ে দাঁড়াতে হয় বলে ওর শরীরের ভারসাম্যও কম, তাই পড়ে গিয়েছিল। আর পড়ে যাওয়ার পর তিন পায়ের সাহায্যে উঠতে হল বলে ওকে অনেক কসরত করতে হয়েছিল। কিন্তু এই হঠাৎ ঘটে যাওয়া আকস্মিক দুর্ঘটনাটাই ডেকে আনল এক নতুন বিপদ। ওর কষ্ট করে উঠে দাঁড়ানোটা মজা দিল ওই বাচ্চা বিচ্ছু দুটোকে। ওরা বারবার ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে লাগল ওকে শুধু দেখবার জন্য যে, কীভাবে উঠে দাঁড়ায় ও।

কয়েক দিনেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল ও। একে খাওয়ার অভাব তায় এই অত্যাচার! অথচ মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া কোনও উপায় নেই।

আবার পুরনো দুঃখগুলো ফিরে এল ওর। কেন ওর পা ভাঙা, কেন ওর মা নেই, কেন ওর শিং নেই। কেন মেয়ে হল ও। যদি পুরুষ হত তবে কত চমৎকার শিং থাকত। দেখতে তো ভাল লাগতই, অস্ত্র হিসেবেও তা কম নয়। তা হলে অন্তত এই বাচ্চা দুটো এইভাবে অত্যাচার করার সাহস পেত না।

আচ্ছা, বেরিয়ে পড়লে কী হয়! হঠাৎ মনে হল ওর। যা হয় হোক। মরতে হয় তাও ভাল। আর সে তো একদিন হবেই। এই বাসার মধ্যে বসে থাকলেই যে মৃত্যু আসবে না তা তো নয়। তার থেকে পথে বেরিয়ে জীবনটাকে সম্পূর্ণভাবে দেখতে-দেখতে মরাই ভাল।

ভাবতে-ভাবতে একসময় ও এত উত্তেজিত হয়ে উঠল যে, তিন পায়েই বেশ তাড়াতাড়ি হেঁটে বড় মোটা গুঁড়ির গাছটা পেরিয়ে বেতের ঝোপটার পাশ কাটিয়ে বেশ কিছুটা চলে একটা গর্তের কাছে এসে পড়ল। ও বুঝতে পারল এটা সেই বদমাশ শেয়ালটার বাসা। মার কাছে শুনে-শুনে ও এখানকার সবকিছুই জেনে গেছে। অচেনা-অদেখা রাস্তাও ওর কাছে খুব চেনা মনে হতে লাগল। আরও কিছুটা এগিয়ে গেলে একটা মাঠ আছে ও শুনেছিল। সেখানে খাবার পাওয়া যাবে জানত ও। সাহস করে এগিয়ে গেল। কিন্তু সেখানে বিকট চেহারার মোষ দেখে আর সাহস রাখতে পারল না। ফিরে চলল। ফেরার পথে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে রাখতে কয়েকটা ছোট্ট গাছ দেখতে পেল, যার পাতা ওর কাছে অতি চেনা। কতদিন মা নিয়ে গেছে এই ছোট্ট সুস্বাদু পাতা।

নিজের জোগাড় করা এই প্রথম খাবার সে অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে খেল। তারপর ভাবল বাসায় ফিরে গিয়ে ঝরনার জল খেয়ে আর নুন-পাথর চেটে শুয়ে পড়বে।

এতটা হেঁটে ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তবু নতুন উৎসাহে পরক্ষণেই ভাবল, মার কাছে যা শুনেছে তাতে তো কাছেই জল আর নুন-পাথর থাকার কথা। সেটা খুঁজে বার করা যাক না।

অল্প সময়ের মধ্যেই পেয়ে গেল জায়গাটা।

মনের আনন্দে বাসায় ফিরল ও।

তারপর থেকেই ও রোজ বিভিন্ন দিকে যেতে লাগল।

একদিন ও একদল হাতি দেখে ফেলল। বিশাল চেহারার জন্তুগুলোকে দেখে ও এতই অবাক হয়ে গেল আর ভয় পেয়ে গেল যে, অকেক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে না খেয়েই বাসায় ফিরল।

তবুও সব মিলিয়ে ওর ভালই লাগছিল। জীবনটাকে সুন্দর মনে হচ্ছিল।

শুধু একটাই যন্ত্রণা ছিল, ওই বিচ্ছু দুটোর অত্যাচার। ওর বাসার কাছে ঘুরঘুর করত ওরা আর সুযোগ পেলেই এসে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিত।

তা, কয়েকদিন পরে এ-সমস্যারই সমাধান করে ফেলল ও। ওদের দেখলেই বসে পড়ত বা শুয়ে পড়ত। যতক্ষণ ওরা থাকত, উঠত না।

দিন কাটতে লাগল। আর প্রথম বাইরে বেরনোর বা স্বাধীনভাবে খাবার জোগাড়ের উত্তেজনা আনন্দও কমতে লাগল।

আবার সেই একঘেয়ে জীবন বিরক্ত করতে লাগল। দুঃখ দিতে থাকল মায়ের মৃত্যু, ভাঙা পা আর শিং না-থাকা। আর দুঃখ দিতে থাকল সঙ্গীর অভাব। ওর কেউ নেই, ওকে কেউ ভালবাসে না— এই দুঃখটা আজকাল বড় বেশি কষ্ট দেয়।

আরও দূরে যেতে হবে ভাবল ও। চেনা-জানা-শোনা পথে বারবার যাওয়া-আসা আর ভাল লাগে না। কিন্তু দূরে যাওয়া ওর পক্ষে খুব সহজও নয়। ছুটতে পারে না, জোরে হাঁটতে পারে না, এমনকী এক নাগাড়ে বেশিক্ষণ ও হাঁটতে পারে না। বিশ্রাম করে-করে যেতে হয় বলে অনেক সময় দরকার। অথচ সন্ধের মধ্যে

বাসায় ফিরতে হলে অত সময় খরচ করা চলে না।

আচ্ছা, না ফিরলেই বা কী হয়! কোথায় ফিরবে, কার কাছে ফিরবে, আর কেনই বা ফিরবে!

এই নতুন ভাবনাটায় খুব আনন্দ পেল ও। রক্ত চনমন করে উঠল। চলবে শুধু চলবে। পথ চলতে চলতে খাবার খুঁজে নেবে, জল খুঁজে নেবে, রাতের আশ্রয় খুঁজে নেবে। কত কী দেখবে, কত কী জানবে!

আবার বেরিয়ে পড়ল ও। এবার আরও দূরে, ফেরার বন্ধন না রেখে; চিরকালের মতো!

শুরু হল তার নতুন জীবন।

প্রথম দু'দিন এমন কিছু ঘটল না যা মনে রাখার মতো। কিন্তু তৃতীয় দিনে ও দেখতে পেল সেই বিভীষিকা। প্রকাণ্ড একটা ময়াল সাপ। একটা গাছের গুঁড়ি বেড় দিয়ে পড়ে রয়েছে। পেটটা উঁচু,প্রকাণ্ড উঁচু। ঠেলে-ঠেলে উঠছে। সদ্য খেয়েছে কোনও জন্তুকে। ওর সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল এই ভয়ঙ্কর সাপটা দেখে।

আর-একদিন ও এমন একটা কাঁটা গাছের ঝোপের মধ্যে আটকে গেল যে, বেরিয়ে আসতে প্রাণ বেরোবার জোগাড়। সর্বাঙ্গ কেটে-ছড়ে একশা।

একদিন ও জঙ্গলের মধ্যে একটা সরু রাস্তা দেখতে পেল। জন্তুজানোয়ার চলে-চলে যেমন পথ তৈরি করে, এটা তেমন নয়,একটু কীরকম যেন। কিন্তু তার ওপর দিয়ে হাঁটতে ওর ভালই লাগছিল। আরও অনেকটা চলার পর ও একধরনের আশ্চর্য প্রাণী দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল। লম্বা-লম্বা সরু দু'পায়ে চলা প্রাণী। অদ্ভুত দেখতে। একটা গাছকে ঘিরে ওরা দাঁড়িয়েছিল আর খুব চিৎকার করছিল।

যে প্রাণীগুলোকে দেখে এত অবাক হল ও, তারা আসলে মানুষ। কাঠুরে। যে পথটা দেখে এর আগে অবাক হয়েছিল আর যার ওপর দিয়ে হাঁটতে ওর ভাল লাগছিল সেটা এদেরই পায়ে-চলা পথ।

চলতে-চলতে কত কী দেখল ও। কতরকম প্রাণী। কতরকম প্রাকৃতিক দৃশ্য। খাবারই বা কতরকম। অবশ্য, এও শিখেছে, সব ফল-পাতাই খাবার নয়। কয়েকদিন আগে এমন একটা গাছের ফল খেয়ে ফেলেছিল যে, গলা, জিভ ফুলে সে এক কাণ্ড!

দিনের পর দিন যায়; মনের আনন্দে পথ চলে ও। চলতে-চলতে কিছু অভিজ্ঞ হয়েছে ও। হয়েছে কিছুটা সতর্ক। কিন্তু তবু মাঝে-মাঝে ছোটখাটো বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়ে।

রাত্রির আশ্রয় জোগাড় করা মাঝে-মাঝে বেশ মুশকিল হয়। ভাল সুরক্ষিত জায়গা রোজ জোটে না। অনেক সময় প্রায় অরক্ষিত ভাবেই রাত কাটাতে হয়। আর সে রাত্রিগুলোতে ভাল ঘুম হয় না। মনে ভয় নিয়ে ঘুমনো যায় না। আবার সেইজন্যই, যেদিন ভাল জায়গা জোটে সেদিন আশ মিটিয়ে ঘুমোয়।

এরকমই একটা ভাল জায়গায় সেদিন শুয়েছিল ও। একটা সরু মুখ পাথুরে গর্ত। বিপদের আশঙ্কা খুব কম। তবুও ঘুমোতে পারছিল না ও। থেকে-থেকে এমন একটা অচেনা উৎকট বিশ্রী গন্ধ নাকে আসছিল যা বিরক্তিকর। কিসের গন্ধ না বুঝতে পেরে অশান্তি বোধ করছিল।

আধো ঘুম আধো জাগা অবস্থায় কেটে চলল সময়। রাত হল আরও গভীর। তারপর ও শুনতে পেল সতর্ক পদক্ষেপে কী যেন এগিয়ে আসছে ওর আস্তানার দিকে।

ব্যগ্র হয়ে উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে রইল ও গর্তটার মুখের দিকে।

পায়ের শব্দ হঠাৎ থেমে গেল। এতক্ষণ ধরে যে গন্ধটা পাচ্ছিল সেটাই আরও দ্বিগুণ হয়ে ভেসে আসতে লাগল।

চুপচাপ কেটে গেল কিছুটা সময়।

তখন ওর কৌতূহল হল খুব। যদিও ভয়ও করছিল যথেষ্ট কিন্তু কৌতূহল দমন করতে না পেরে উঠে দাঁড়াল ও। বেরিয়ে এল বাইরে।

আকাশে অর্ধেক চাঁদ। তার মৃদু আলোয় প্রথমেই দেখতে পেল ও বড়-বড় উজ্জ্বল নীল দুটো চোখ।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইল ও স্থির চোখ দুটোর দিকে। আশ্চর্য, চোখ দুটো নড়ছে না, সরছে না। ক্রমে ও দেখতে পেল জন্তুটাকে। খুব একটা বড় নয়। কিন্তু এমন একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তেলতেলে রঙিন চেহারা; পায়ের, ঘাড়ের আর পেটের পেশীগুলো এত প্রকট আর মসৃণ যে, দেখলেই মনে হয় অন্যান্য জন্তুর থেকে এ একেবারেই আলাদা। চকিতে ওর মনে পড়ে গেল মায়ের বর্ণনা, তক্ষুনি ও চিনতে পারল জন্তুটিকে। এ হল সেই জন্তু, যারা তৃণভোজী প্রাণীর যম। এ হল এই জঙ্গল রাজত্বের রাজার জাত— বাঘ।

বাঘটা একভাবে ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। লেজটা দু'বার আছড়াল পিঠের ওপর। লম্বা জিভটা বার করে দু'পাশের কষে বুলিয়ে নিল। তারপর দুল্‌কি চালে এগিয়ে আসতে লাগল ওর দিকে।

ওর তিনটে পা কাঁপতে লাগল। গলার কাছে ঠেলে উঠতে লাগল একটা কিসের যেন পিণ্ড। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ধপাস করে পড়ে গেল।

বাঘটা ওর পাশে এসে দাঁড়াল। সামনের দুটো পা এগিয়ে দিয়ে পিঠটাকে ধনুকের মতো বেঁকিয়ে আড়মোড়া ভাঙল। একটা প্রকাণ্ড হাই তুলল। তারপর ঢুকে গেল গুহাটার মধ্যে। গুহাটা ছিল বাঘটারই বাসা।

ওর শরীরে তখন কোনও জোর নেই। ও নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য তৈরি হয়েছিল। এখন অভাবিত ভাবে বেঁচে গিয়েও উঠে যে চলে যাবে সে শক্তি তার ছিল না।

অনেকক্ষণ সেইভাবেই বসে থেকে ও উঠল। লেংচে-লেংচে এগিয়ে চলল আকাশটা যেদিকে ফিকে হয়ে আসছে সেদিকে।

দুপুরবেলা ও এসে হাজির হল একটা প্রকাণ্ড মাঠে। মাঠে নেমে পড়ল। যেতে-যেতে আবার ও দেখতে পেল কিছু মানুষ। আরও চলতে-চলতে অনেক নতুন জন্তুও দেখতে পেল। গোরু, ছাগল, ভেড়া, গাধা, এমনকী একটা ঘোড়াও ঘাস খাচ্ছিল এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।

আরও এগোল ও, আরও এগোল। কোনওদিকে জঙ্গল না দেখতে পেয়ে ভয় লাগল ওর। চিন্তা হল।

তবুও এগিয়ে চলল।

এসে হাজির হল একটা গ্রামে।

চারদিকে অবাক হয়ে তাকাতে লাগল। যা দেখে তাই নতুন, অপরিচিত, অদ্ভুত।

হঠাৎ গ্রামের কয়েকটা কুকুর তেড়ে এল ওর দিকে। ও পালাতে গেল। কিন্তু তিন পায়ে পালানো যায় না। পড়ে গেল। কুকুরগুলো ওর কাছে এসে ওকে প্রায় ঘিরে ফেলে প্রচণ্ড চিৎকার করতে লাগল।

তখন একটা ষণ্ডাগোছের মানুষ লাঠি নিয়ে ছুটতে-ছুটতে এসে কুকুরগুলোকে তাড়িয়ে দিল। লোকটির মাথায় একটা গামছা জড়ানো ছিল পাগড়ির মতো। সেটা খুলে নিয়ে ওর গলায় বেঁধে টানতে-টানতে নিজের বাড়ি নিয়ে গেল।

একটা ছোট্ট ঘরে ওকে বেঁধে সামনে জল, খড়, ঘাস ইত্যাদি রেখে এল।

মানুষটা খুব খুশি হল হরিণটাকে পেয়ে।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

সোনার গনপতি 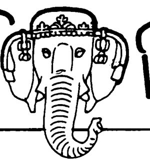 হিরের চোখ

এদিকে শুভঙ্কর ও মউয়ের চেঁচামেচিতে সবাই ছুটে এল সেখানে। গ্রামসুদ্ধু লোক যেন ভেঙে পড়ল।

পুণ্ডরীককাকা এবং কাকিমা 'তিন্নি-তিন্নি' করে কত খুঁজলেন তিন্নিকে। ঘরে-বাইরে, মাঠে-ঘাটে কোথাও পাওয়া গেল না। মেয়ের জন্য হন্যে হয়ে উঠলেন কাকা-কাকিমা। তবুও তিন্নির খোঁজ পাওয়া গেল না কোথাও। পরিস্থিতিই বুঝিয়ে দিল শুধু বিল্টু নয়, তিন্নিকেও নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা।

পুণ্ডরীককাকা দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে তক্ষুনি চললেন পুলিশে খবর দিতে।

আর কাকিমা! "উঃ মাগো," বলে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

ঠিক এই অবস্থায় কী যে করা যায় বা কী করা উচিত তা কেউ ঠিক করতে পারল না। প্রতিবেশিনীরা কাকিমাকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গিয়ে চোখে-মুখে জল দিতে লাগলেন।

শুভঙ্কর বোবার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখতে লাগল। সে যেমনই বিস্মিত, তেমনই হতচকিত।

এক সময় মউই শুভঙ্করের একটি হাতে টান দিয়ে বলল, "তুমি একবার এসো তো আমার সঙ্গে।"

শুভঙ্কর কিছু না জেনেই নীরবে অনুসরণ করল ওকে।

যেতে-যেতে মউ বলল, "আমার অনুমান কতখানি ঠিক তা বুঝলে তো? আমি তোমাকে বলেছিলাম না ওরা আশপাশেই কোথাও আছে। হাতেনাতেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল।"

শুভঙ্কর বলল, "সত্যি! তুমি মেয়ে হতে পারো। আমার সমবয়সী কিংবা হয়তো দু-এক বছরের ছোট। তবু তুমি অনেক বুদ্ধি রাখো। কিন্তু এই রাতদুপুরে অন্ধকারে কোথায় যাচ্ছ তুমি?"

"এসোই না আমার সঙ্গে।"

"এদিকে ওপরের ঘরটা খালি রইল যে!"

"থাকুক। ও ঘরে কেউ ঢুকবে না।"

"তুমি তো জানো না মউ, কী অমূল্য ধন ওই ঘরের মধ্যে লুকনো আছে। জানলে এ-কথা বলতে না।"

মউ এবার চলা থামিয়ে বলল, "হ্যাঁ, কী ব্যাপার বলো তো। সেই থেকে তোমরা কী যেন বলি-বলি করছ, অথচ বলছ না। দারুণ একটা সাসপেন্সের মধ্যে রাখছ আমাকে। এবার সত্যি করে বলো তো শুনি, ব্যাপারটা কী?"

শুভঙ্কর বলল, "এই ঘরের ভেতর বিল্টুর দাদুর একটা মূল্যবান ডায়েরি আছে। আর আছে ওই ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা এক সোনার গণপতি। যাঁর চোখ দুটো হিরের।"

"বলো কী?"

"বিল্টুর ধারণা এবং ওই ডায়েরির লেখা পড়ে আমারও ধারণা, সোনার গণপতির অভিশাপে বিল্টুদের পরিবার আজ ভেসে যেতে চলেছে। তাই আমরা এসেছি ওই গণপতি দেবতাকে ইটের পাঁজর থেকে বের করে এনে যথাস্থানে পৌঁছে দিতে।"

"সেই যথাস্থানটা কোথায় জানতে পারি কী?"

"নিশ্চয়ই। সে স্থান বহুদূরে। ইচ্ছে করলেই সেখানে যাওয়া যায় না। সেখানে যেতে গেলে সমস্ত রকমের মায়া-মমতা ত্যাগ করে, ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে দিয়ে যেতে হবে। কৈলাশের পাদমূলে মানস সরোবরে। মূর্তিটা অবশ্য ফেলতে হবে রাবণ হ্রদে।"

"তোমরা কি সত্যিই সেখানে যাবে?"

"যাব না মানে?"

"কে কে যাবে?"

"আপাতত তিনজনে। বিল্টু, আমি আর তিন্নি।"

"আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে।"

"সত্যি?"

"সত্যি না তো কি মিথ্যে?"

"খুব ভাল হয় তা হলে।"

"কবে যাবে ঠিক করেছ?"

"তা কি এখন বলা যায়? আগে মূর্তিটা হাতে পাই, টাকাপয়সা জোগাড় করি, তবে তো।"

মউ বলল, "ঠিক আছে। তবে একটা কথা, আজ রাতে ওই ঘর ছেড়ে তুমি কিন্তু কোথাও যেও না।"

"বেশ।"

"রিভলভারটা তোমার কাছে-কাছেই আছে তো?"

"আছে। তবে এখন এই মুহূর্তে এখানে নেই। ঘরের ভেতর বালিশের তলায় চাপা দেওয়া আছে।"

"ঠিক আছে। এখন থেকে ওটা সব সময় কাছে-কাছেই রাখবে তুমি।"

শুভঙ্কর বলল, "তা তো রাখতেই হবে।"

"আর শোনো, আজ রাতে নীচের ঘরের দরজাটা খোলা রেখে ওপরের ঘরের জানালা বন্ধ করে দরজায় খিল দিয়ে সজাগ থাকবে।"

কৌতূহলী শুভঙ্কর প্রশ্ন করল, "কেন?"

"হয়তো মাঝরাতে অথবা শেষ রাতে আমি গিয়ে ডাকব তোমায়। আমি ছাড়া আর কেউ ডাকলে না বুঝে দরজা খুলো না তুমি। আগে সাড়া বুঝবে, তারপর দরজা খুলবে।"

"পুলিশ এলে?"

"পুলিশ এলে দরজা তো অবশ্যই খুলতে হবে। তবে আসল পুলিশ কি নকল পুলিশ সেটা জানবার জন্য পুণ্ডরীককাকাকে ডাকাবে। উনি খুলতে বললে তবেই খুলবে দরজা। না হলে শিকারি বাজের দল রাত দুপুরে 'আমরা থানা থেকে আসছি' বলে দরজা খোলাতে পারে।"

শুভঙ্কর বলল, "আমি তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি। কিন্তু এখন তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"কোনও অকাজে নয়। এসো, দেখতে পাবে।"

শুভঙ্কর মউয়ের পিছু-পিছু পথ চলতে লাগল। এদিক-সেদিক করে অন্ধকার শালবনের ভেতর দিয়ে ওরা এক জায়গায় একটি মাটির

ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়ির ভেতরে ঢুকে উঠোনে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল মউ, "বুদ্ধু! এই বুদ্ধু!"

দাওয়ায় একটি চিমনি লণ্ঠন জ্বলছিল। সেখানে মাদুর পেতে শুয়েছিল এক বুড়ি। মউয়ের গলা শুনে ঘরের দিকে মুখ করে ডাকল, "খোকা! এই খোকা! দ্যাখ তো কে?"

ঘরের ভেতর থেকে বুদ্ধু বেরিয়ে এল। ঘন কৃষ্ণবর্ণের কুড়ি-বাইশ বছরের এক যুবক। বলিষ্ঠ দেহ। মজবুত গড়ন। মাথায় কোঁকড়া চুল। অসম্ভব তেজী। বুদ্ধু বেরিয়ে এসে বলল, "কে!"

"আমি রে।"

বুদ্ধু একটু অপ্রসন্ন এবং ভারিক্কি গলায় বলল, "কী চাই?"

"একটা বিশেষ দরকারে তোর কাছে এসেছি ভাই। তোর মোটর বাইকটা একবার দিবি আমাকে?"

"না। ও আমি কাউকেই দিইনি। তোকেও দেব না। তা ছাড়া তোর হাত সেটই হয়নি ভাল করে। ব্যালান্সই হয়নি।"

"ভয় নেই। তোর গাড়ির ক্ষতি করব না আমি।"

"বললুম তো দেব না।"

"বুঝেছি। আসলে এ-কথা তুই বলছিস না। তোর রাগ বলছে। সেদিন বারোয়ারিতলায় তোকে আমি মারধর করেছিলাম, সেই রাগে তুই দিবি না। অথচ রাগের মাথায় এইরকম করে মনে-মনে আমি যে কত দুঃখ পেয়েছিলাম, তা কি তুই জানিস?"

বুদ্ধু গম্ভীর গলায় বলল, "তোর আর কিছু বলার আছে?"

"আছে।"

"তাড়াতাড়ি বল।"

"শোন বুদ্ধু। দুর্বুদ্ধি মানুষকে দিয়ে অন্যায় করায়। কিন্তু পরিস্থিতিই তাকে সুযোগ দেয় সেই দোষ ঢেকে ফেলার। তেমনি, তুই সেদিন যে অন্যায়টা করেছিস, আজই তোর সুযোগ এসেছে সেই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করার। দোষ আমারও আছে। সেইজন্য তোকে ওইরকম অপমান করেও আবার তোরই কাছে এসেছি সাহায্য চাইতে।"

"কিন্তু…।"

"তুই শুনেছিস নিশ্চয়ই শিকারি বাজ আমার বাবাকে কীভাবে খুন করেছে। আমার বাবার কাছে তুইও তো পড়েছিস। আমার বাবার ছাত্র তুই। আমাকে তুই ফিরিয়ে দিবি? তা ছাড়া ওই শয়তানি শিকারি বাজের লোকেরা আজ এইমাত্র বিল্টুদাকে তুলে নিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে নিয়ে গেছে পুণ্ডরীককাকার মেয়ে তিন্নিকেও।"

বুদ্ধু যেন শিউরে উঠল, "সে কী!"

"তোরা গ্রামে বাস করেও তো গ্রামের মানুষ নোস। এখন তামুকপালের ফ্যাক্টরিতে কাজ পেয়েছিস, কম্পানির টাকায় মোটর বাইক কিনেছিস, কত বড় হয়েছিস তোরা। আর আমরা, যে কে সেই আছি। পুলিশ এসে যদি কিছু করে তো করবে, না হলে যা হয় হবে এই ভেবে জোয়ান ছেলে হয়ে ভর সন্ধেবেলা ঘরে ঢুকে প্যাঁচার মতো বসে আছিস। তোর দুটি পায়ে পড়ি আমাকে একবার তোর বাইকটা দে। কেননা, আমার সাইকেলে হবে না। তা ছাড়া আজ এই মুহূর্তে আমার বাড়ির যা অবস্থা, তাতে ঘর থেকে সাইকেলও বার করা যাবে না।"

বুদ্ধু বলল, "বাইকটা কখন ফেরত পাব?"

"আজ রাতেই। অথবা কাল সকালে।"

"ঠিক আছে। দেব তোকে। একটু দাঁড়া। বার করে আনছি।" বলে পাশের একটি ঘর থেকে লাল রঙের নতুন ঝকমকে মোটর বাইকটা বার করে এনে মউয়ের হাতে দিয়ে বুদ্ধু বলল, "খুব সাবধানে চালাবি কিন্তু? তুই যা লিকপিক করে চালাস, দেখলে ভয় লাগে।"

মউ বলল, "কবে আমাকে লিকপিক করে চালাতে দেখেছিস তুই?"

"মাস দুই আগে শুঁটেদার বাইকটা নিয়ে ঘুরছিলি না তুই?"

"এখন দেখবি? এই দ্যাখ।" বলেই একবার প্রচণ্ড বেগে বাইকটা নিয়ে চক্কর দিয়ে এসে বলল, "কী দেখলি?"

"দেখলাম। ঠিক আছে। কোথাও ধাক্কা-টাক্কা লাগাস না যেন।" তারপর হঠাৎই শুভঙ্করের দিকে চোখ পড়ায় বুদ্ধু বলল, "এ ছেলেটি কে রে?"

"তুই চিনবি না। ও ডি·এস·পি· সাহেবের ছেলে। শুভঙ্কর। আমাদের গ্রামে বিল্টুদার সঙ্গে বেড়াতে এসেছে। আমার বন্ধু।"

"অ।"

মউ বলল, "শুভঙ্কর! আমাদের কথা শুনে তুমি খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ, তাই না? আসলে বুদ্ধুটা সত্যিই বুদ্ধু। কিন্তু ওর মনটা কত নরম। তা দেখলে তো? যদিও ও তোমার-আমার চেয়ে অনেক বড়, তবু ও আমাদের চেয়েও অনেক ছেলেমানুষ। তুমি এক কাজ করো, এই পথটা ধরে সোজা চলে যাও। খানিক গিয়ে বাঁ দিকের প্রথম রাস্তাটা ধরে এগোলেই বাড়ি চলে যেতে পারবে। আমি একটু এগিয়ে দেখি ওদের কোনও সন্ধান পাই কি না।"

শুভঙ্করের বুক শুকিয়ে গেল ভয়ে। বলল, "কেন, আমাকেও তোমার সঙ্গে নাও না!"

"আমি কখনও ডবল ক্যারি করিনি। তাড়াহুড়োর মাথায় যদি তোমাকে সামলাতে না পারি? তার চেয়ে তুমি যাও। তা ছাড়া তোমার এখন ঘর আগলানো দরকার। তোমাকে যা-যা বললাম, মনে রেখো। আমি আসছি।" বলেই চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল মউ। (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

পৌষ মাসের আকাশ

অরূপরতন ভট্টাচার্য

শীতের দু'টি মাস আকাশ দেখার অনুকূল সময় । পৃথিবীতে দেশ-মহাদেশ ও পাহাড়-পর্বতের অনেক পরিবর্তন হয়েছে । কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষরা আকাশের পটভূমিতে যেভাবে তারাদের দেখেছিলেন, আজও সেইসব তারা ঠিক সেভাবেই আমরা দেখতে পাই । চাঁদের আলোয় ছোট তারারা হারিয়ে যেতে পারে, কিন্তু অন্ধকারের রাতগুলিতে তেমন কোনও আশঙ্কা নেই ।

এখন আকাশে তারার হাট । দিনের আলোর গভীরে যারা থাকে দৃষ্টির অন্তরালে, সন্ধের অন্ধকার ঘন হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাদের ছড়ানো-ছিটানো অপরূপ শোভা—কোথাও আছে ঘন হয়ে একসঙ্গে দল বেঁধে, কোথাও আবার অবিন্যস্ত এলোমেলো ।

শীতের মাসগুলি আকাশ দেখার অনুকূল সময় । উজ্জ্বল তারায়-তারায় ফোটা এক-একটা তারকামণ্ডল তার স্বাভাবিক চেহারা নিয়ে আমাদের চোখের সামনে ধরা পড়ে । ভাবলে অবাক লাগে, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, দেশ-মহাদেশ কত দ্রুত বদলে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের কত আগের পূর্ব-পুরুষদের চোখেও আকাশের পটভূমিতে তারাদের আসর সাজানো ছিল প্রায় একই ভাবে ।

পৌষ মাসের মাঝামাঝি, রাত আর-একটু ঘন হোক । আকাশে অনেক উজ্জ্বল তারকা এখন নজরে আসার সময় । শীতকাল, এখন মেঘের উপদ্রব নেই বললেই চলে । জ্যোৎস্নাবিহীন আকাশ হলে আরও ভাল । চাঁদের আলোয় ছোট তারারা হারিয়ে যেতে পারে, কিন্তু অন্ধকারের রাতগুলিতে তেমন কোনও আশঙ্কা নেই । সেখানে সবাই তার আপন আপন ঔজ্জ্বল্য নিয়ে ধরা পড়বে ।

এখনকার রাত আটটার আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে দ্যাখো । কত উজ্জ্বল তারার ভিতর দিয়ে ছায়াপথ নেমে গিয়েছে প্রায় উত্তর থেকে দক্ষিণের আকাশে । পেগাসাস এনড্রেমিডা হেলে যাচ্ছে পশ্চিমে । দুটি মীন নিয়ে রেবতী পশ্চিমেরও কোলে । আর রেবতীর দক্ষিণে অনেকটা জায়গা নিয়ে ছড়ানো সিটাসও অস্তে যায়-যায় ।

এখনকার সন্ধের অন্ধকারে ছায়াপথের উপরে উত্তর থেকে দক্ষিণে পর-পর সাজানো দেখা যায় ক্যাসিওপিয়া, পারাসিয়ুস, অরিগা মণ্ডল । প্রায় মাঝ আকাশে অরিগা মণ্ডল । অরিগা মণ্ডলের অতি উজ্জ্বল তারা ব্রহ্মহৃদয় । এ-তারা আকাশে ধরা না পড়ার মতো নয় । খালি চোখে দেখা আকাশে ষষ্ঠ উজ্জ্বল তারকা । আকাশে অনেক তারার ভিতর থেকে একে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না ।

[১৫ পৌষ রাত্রি সাড়ে আটটা, ২২ পৌষ রাত্রি আটটা ও ২৯ পৌষ রাত্রি সাড়ে সাতটার আকাশপট—আমাদের অঞ্চলের আকাশসঙ্গী

কালপুরুষমণ্ডল

কিন্তু এ-মাসে সন্ধের অন্ধকারে সবচেয়ে আকর্ষক হল কালপুরুষ মণ্ডল । কালপুরুষের বিদেশী নাম ওরায়ন । নাম শুনলেই মণ্ডলটার একটা পরিচয় পাওয়া যায় । ছোট-বড় অনেক তারায় ঠিক যেন এক মানুষের মূর্তি । উজ্জ্বল তারাগুলি সে মূর্তির চেহারা যেন আরও বিশিষ্ট করে তুলেছে । পশ্চিম-উত্তর থেকে যে ছায়াপথ নেমে এসেছে, প্রায় আকাশের দক্ষিণ পর্যন্ত, সেই ছায়াপথের সামান্য পশ্চিম ঘেঁষে দক্ষিণ আকাশে মণ্ডলটি নজরে আসবে ।

কালপুরুষের চেহারাটি উত্তর থেকে দক্ষিণে নেমে এসেছে ক্রমে-ক্রমে । মাথার দিকে দুটি তারা দুটি কাঁধের উপরে বসানো—এই তারা দুটি থেকেই কালপুরুষের দুটি বাহুর শুরু ।

শরীরের মাঝের দিকে তিনটি তারা আছে একটি সরল রেখায়—কালপুরুষের কটিবন্ধের তিনটি তারকা যেন । কোমরের কাছে ডান দিকে ছোট-ছোট ক'টি তারকা সাজানো, মনে হয় খাপে ঢাকা তলোয়ার

ছবি : পরমেশ পুরকায়স্থ

ঝুলছে কটিবন্ধ থেকে। একেবারে যোদ্ধার বেশ। কিন্তু যোদ্ধার কটিবন্ধে শুধু খাপে ঢাকা তলোয়ার থাকলে চলে না। ঢাল-তলোয়ার ছাড়া কি যোদ্ধাকে মানায় ? কালপুরুষ এমন একটা মণ্ডল, যার তারায়-তারায় চেহারার পশ্চিম দিকে একটা ঢালের ছবিও ফুটে ওঠে। কালপুরুষের দুটি পায়ের দুই উজ্জ্বল তারা—এক পা সামনে আর এক পা পিছনে রেখে দাঁড়িয়ে আছে যুদ্ধ করার দৃপ্ত ভঙ্গিতে।

তুমি যদি কালপুরুষ মণ্ডলকে লক্ষ করো, তা হলে ১০-এর চেয়ে বেশি উজ্জ্বল তারা নিশ্চয়ই দেখতে পাবে। এর মধ্যে আর্দ্রা আর বাণবাজার আলাদা মর্যাদা। কালপুরুষের মাথার দক্ষিণে বাহু নির্দেশ করছে যে দুটি তারকা, তার পূর্ব দিকেরটি বেশি উজ্জ্বল, এটির নাম আর্দ্রা, বিদেশী পরিচয়ে বিটেলজিয়ুস। আকাশে খালি চোখে প্রথম যে কুড়িটি তারা দেখা যায়, এটি আছে তারই মধ্যে। আকাশের দ্বাদশ উজ্জ্বলতম তারকা। সত্যি কথা বলতে কি, বলবান কালপুরুষের হাতেই শোভা পায়। অবশ্য কালপুরুষ মণ্ডলে আর্দ্রার চেয়েও আর-একটি উজ্জ্বল তারা আছে। এটি বাণরাজা, বিদেশী নাম রিগোল। আর্দ্রা ডান কাঁধের তারকা আর বাণরাজা আছে তার উলটো দিকে বাঁ পায়ের উপরে। খালি চোখে দেখা আকাশের সপ্তম উজ্জ্বল তারকা এটি। কালপুরুষের বাঁ পায়ের বাণরাজাকে একটি তারা হিসেবে মনে হলেও আসলে কিন্তু এটি একটি তারা নয় ; বাণরাজাতে আছে দুটি তারা, খুব কাছাকাছি। এত উজ্জ্বল যে কল্পনাতেও আনা যায় না। সূর্য তো এমনিতেই কত উজ্জ্বল, কিন্তু বাণরাজা সূর্যের ৫০০০০ গুণের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল বলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ধারণা। ভাবতে পারা যায় ! যদি এ মাত্র সূর্যের মতো দূরে থাকত তা হলে কী কাণ্ডটাই না হত তা হলে। কালপুরুষে আরও একটা উজ্জ্বল তারার কথা বলতে হয়, এটির নাম কার্তিকেয়। আর্দ্রা যেমন একটি কাঁধ, কার্তিকেয় তেমনি অপরটি। তারাটির বিদেশী নাম বেলাট্রিক্স্। এই যে কালপুরুষের এত উজ্জ্বল তারকা, এরা কোনওটাই কিন্তু ক্যাপেলা মণ্ডলের ব্রহ্মহৃদয়কে ঔজ্জ্বল্যের দিক দিয়ে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।

কালপুরুষের বৈশিষ্ট্যের কথা বলে শেষ করা যায় না। কোমরের তরবারির কাছে আছে একটা নীহারিকা। খালি চোখে দেখলে মনে হয়, যেন ওখানকার তারার চারপাশে রয়েছে অস্পষ্ট পরদার একটা অস্বচ্ছ আবরণ। এটি একটি গ্যাসীয় নীহারিকা। যদি কখনও দূরবিনে দেখার সুযোগ পাও, তা হলে দেখবে এ-এক অদ্ভুত সুন্দর বস্তু।

ভারতীয় জ্যোতিষে চান্দ্র-তিথিকে নিয়ে যে ২৭টি নক্ষত্র আছে চাঁদের ২৭ স্ত্রী হিসেবে, এর মধ্যে কালপুরুষের তারায় তারায় দুটি স্ত্রী-কে দেখতে পাওয়া যায়। এর একটি আর্দ্রা। আর্দ্রায় মাত্র একটি তারকা। ২৭টি তারকার মধ্যে চাঁদের ছ' সংখ্যক স্ত্রী এটি।

চাঁদের আরও একটি স্ত্রী আছে কালপুরুষের তারাদের নিয়ে। এটি হল মৃগশিরা। পৌষ মাসের মাঝামাঝি সন্ধে ঘন হওয়ার পরে দক্ষিণ আকাশে কালপুরুষ যখন অনেকটা মাথার উপরে উঠে আসে, তখন তার দুই কাঁধের উত্তরে ঠিক মাঝামাঝি আছে এই মৃগশিরা নক্ষত্র। এ হল চান্দ্র-তিথির পঞ্চম স্ত্রী আর পঞ্চম নক্ষত্র।

আকাশে কালপুরুষের পূর্ব-পশ্চিমে অনেক তারা আর তারকামণ্ডলের ছড়াছড়ি। তারা চিনতে চিনতে রাত গভীর আর আকাশ আরও আকর্ষক হয়ে উঠছে। কালপুরুষকে নিয়ে আর্দ্রা, মৃগশিরা সরে যাচ্ছে পশ্চিমে। পশ্চিমে সাপের আকারে জড়ানো বৃহৎ মণ্ডল এরিডেনাম, আরও পশ্চিমে সিটাস।

এই সিটাসের উত্তরে রাশিচক্রের শেষ রাশি মীন রাশির দুটি মীনের ঠিক পূর্বে দেখা যাবে প্রথম রাশি মেষ রাশিকে। মেষ রাশি আকাশে খুব অল্প জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে আছে। ম্লান তারায় মেষের আকার বোঝা কঠিন,কিন্তু এই তারাদের নিয়েই আছে চাঁদের প্রথম তিথি আর স্ত্রী অশ্বিনী। চাঁদের দ্বিতীয় স্ত্রী ভরণীর তারকারাও মেষ রাশির তারায় তারায় তৈরি। অশ্বিনীর তারায় তারায় অশ্বমুখের কল্পনা।

আকাশে সন্ধের অন্ধকারে মাথার উপরে দেখা তারকারা গভীর রাতে পশ্চিম দিগন্তে। পূর্বে যারা দিগন্তের আড়াল থেকে উঠে আসছিল, তারা এখন সরাসরি উপরের আকাশে। এইভাবে রাতের পর রাত মাথার উপরে আকাশপটের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে প্রতি মাসে নতুন তারকাচিত্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মনে রাখতে হবে, আকাশপটের দিকের সঙ্গে পার্থিব উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম মিলবে না। সেই জন্য তারকাপটটিকে মাথার উপরে নীচের দিক করে ধরে উত্তর-দক্ষিণ মিলিয়ে নিতে হবে। পূর্ব-পশ্চিম মিলে যাবে সঙ্গে-সঙ্গে।

যে তিনটি শব্দ আপনার মাথায় সবসময় ঘুরছে,
তাদের ভার ইউনাইটেড ইন্ডিয়াকেই দিন :

"তবে কি হবে..."

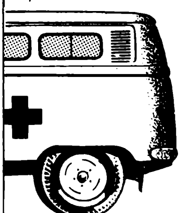

...আপনার বৃদ্ধ পিতার কিডনির গণ্ডগোল শুরু হয়েছে।
...এক্‌জিকিউটিভের কাজের চাপে আচমকা আপনার হৃদযন্ত্রে গোলমাল দেখা দিয়েছে।
...খেলায় মত্ত আপনার ছেলে, হাত পা ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে। এসবই বাস্তব ঘটনা, কোন ভুল নেই।

ঈশ্বর না করুন এমনটি হয়।

এখানে সত্য ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে আপনাকে বোঝাবার জন্য : এদেশের হাজার হাজার লোক এখন মেডিক্লেম-এর মর্ম বোঝেন — কারণ দিন দিন সামর্থ্যের বাইরে চলে যাওয়া চিকিৎসা খরচের মোকাবিলা করার এই হলো সবচেয়ে সহজ ও সেরা উপায়।

মাত্র ২৫০ টাকার বিনিময়ে পরিশোধযোগ্য প্রকল্পে আপনি হাসপাতালের চিকিৎসা খরচ বাবদ ১৭,৬০০ টাকা পর্যন্ত পাবেন।

আমরা চাই বা না চাই,জীবনের ওঠা-পড়া তো লেগেই থাকবে।

তাহলে আগামীকাল কাজে বেরোবার সময়ে আপনার কাছাকাছি ইউ আই অফিসে চলে আসুন—আপনি মেনে নেবেন যে...

পরে আক্ষেপের চেয়ে মেডিক্লেম-এর নিরাপত্তা অনেক ভালো।

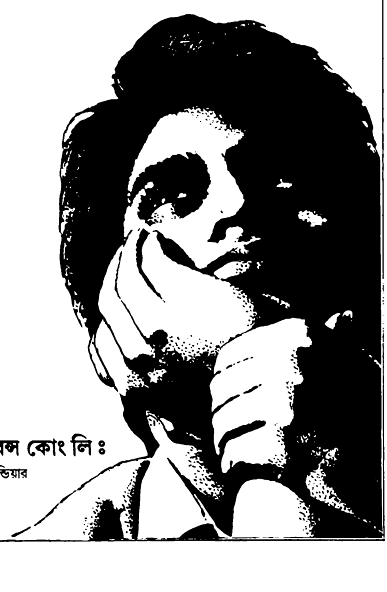

MED-I-CLAIM

ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনস্যুরেন্স কোং লি ঃ
(জেনারেল ইনস্যুরেন্স করপোরেশন অফ ইন্ডিয়ার একটি সহযোগী সংস্থা)
২৪ হোয়াইট্‌স রোড, মাদ্রাজ ৬০০ ০১৪

UNITED INDIA

HTA 7350

আর্গোস

শিশিরকুমার দাশ

আমাদের প্রথমেই আজ ইতিহাসের পিরিয়ড। আমি কিছুতেই মন লাগাতে পারছিলাম না। আমাদের পড়ানো হচ্ছিল পানিপথের যুদ্ধ। আমি বসে-বসে ভাবছিলাম আর্গোসের কথা। কোন দিকে গেল। আমাদের ইস্কুলের ভেতরে অনেকটা জায়গা আছে। পেছন দিকে অনেক গাছপালা আর একটা বড় গির্জা। সেদিকে গেলে বিশেষ ভয় নেই। কিন্তু যদি অন্য দিকে চলে যায়, সেদিকে বড় রাস্তা, ভীষণ ভিড়। সেখানে যদি গাড়ি-ঘোড়ার মধ্যে পড়ে তা হলে আর বাঁচবে না। কিন্তু আমি কোথায় খুঁজব। টিফিনের সময় দেখতে পারি। অন্যদের বেঞ্চির নীচে তাকিয়ে দেখলাম, যদি আর্গোস কোথাও লুকিয়ে বসে থাকে। আজ বাড়ি ফিরেই আর্গোসকে দু'ঘা কষাব। ভীষণ রাগ হল আর্গোসের ওপর। কিন্তু ও বাড়ি ফিরবে তো!

পরের পিরিয়ডে ছিল অঙ্ক। আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। মিসেস গোস্বামী আমাদের অঙ্ক পড়ান। আমি জানলার বাইরে তাকিয়ে ছিলাম বলে বকুনি খেলাম। অঙ্ক ভুল করলাম। রুবি সব অঙ্ক রাইট করল। আমাকে ও একবার চিমটি কাটল। আমি কিছুই বললাম না। আমরা সবাই তো ছুটি হলে বাড়ি ফিরব। কিন্তু আর্গোস! রাত্রে ও কোথায় থাকবে। খাবে কী? এইসব ভাবছি, এমন সময় দেখি করিডরে মিস লাহা আর মিস দেবীসুন্দরম খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছেন। একেবারে আমাদের ক্লাসরুমের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, "চৌকিদার।"

মিস লাহা খুব কড়া মেজাজের মহিলা। সবাই ভয় পায়। চৌকিদারকে চেঁচিয়ে বলছেন, "এ কুত্তা কাঁহাসে আয়া?"

চৌকিদার দূর থেকেই বলল, "কুত্তা, কৌনসা কুত্তা?"

মিস লাহা চেঁচিয়ে বললেন, "কৌনসা কুত্তা তা আমি কী জানি। আমার ক্লাসের মধ্যে কুকুর ঢুকেছে। মেয়েরা সব চেয়ার ছেড়ে লাফালাফি করছে। একজনের চশমা ভেঙে গেছে।"

ওঁদের কথাবার্তা আমি কান খাড়া করে শুনছিলাম। মিস লাহা নাকি কুকুরকে তাড়া করতেই সে দেবীসুন্দরম্-এর ক্লাসে ঢুকে পড়েছে। তিনি নিরীহ ভালমানুষ, কর্ণাটকি সঙ্গীত জানেন, আর বায়োলজি পড়ান। কুকুর নাকি তাঁর ক্লাসে ঢুকে ফার্স্ট বেঞ্চে একটি মেয়ের পাশে বসে ছিল। মেয়েটি আঃ-আঃ বলে অজ্ঞান হয়ে যায়। একটি মেয়ে কুকুর তাড়াবার জন্য একটি কমলালেবু ছুঁড়ে মেরেছিল, কমলালেবুটা মিস লাহার খোঁপার একটা কোণে লেগে রিবাউন্ড হয়ে একটি মেয়ের চশমায় লেগেছে। আর সেই সময় কুকুর হাওয়া।

এসব শুনে আমার তো বুক শুকিয়ে গেছে। আমি তো বুঝতে পারছি এ কুকুর কে। আমাকে বোধহয় ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু আমার কী দোষ!

এর পরের পিরিয়ড ইংরেজির। ইংরেজির টিচার ঢুকেই বললেন, "এত চেঁচামেচি কেন?"

একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "মিস লাহার ক্লাসে একটা কুকুর ঢুকে পড়েছিল।"

আমাদের টিচার একটু হাসলেন। তারপর বললেন, "তা কাউকে কামড়ায়নি তো।"

এমন সময় চৌকিদার ক্লাসের মধ্যে ঢুকে বললে, "মেমসাব, ইঁহা কৌই কুত্তা তো নেহী হ্যায় ?"

আমাদের টিচার বিরক্ত হয়ে বললেন, "তোমাদের কী সব মাথা খারাপ। ক্লাসে-ক্লাসে কুকুর খুঁজছ ? রাস্তা থেকে একটা স্ট্রে ডগ্ ঢুকে পড়েছে, চলে যাবে, অত হইচই কেন ?"

চৌকিদার বলল, "গুস্তাখি মাফ। মিস লাহা বলে দিয়েছেন সব ঘরে খুঁজে দেখতে।"

আমাদের টিচার বললেন, "খুঁজে দ্যাখো।" আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাদের কারও ব্যাগের মধ্যে যদি কুকুর-বেড়াল কিছু থাকে তো, বার করে দাও।"

চৌকিদার হাসতে হাসতে চলে গেল।

আমি ভাবলাম বিপদ বুঝি কেটে গেল। কিন্তু না। ক্লাসের শেষেই এলেন মিস লাহা। তিনি ক্লাসে-ক্লাসে জিজ্ঞেস করে বেড়াচ্ছেন কার কুকুর। যদি না বলি তা হলে উনি মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে খবর দেবেন, কুকুর ধরে নিয়ে যাবে। আমি ভাবলাম যে মিস লাহাকে পুরো ব্যাপারটা বলে দেওয়াই ভাল।

আমি বললাম, "মিস, আমার সঙ্গে আমার কুকুর আজ স্কুলে এসেছিল, কিন্তু..."

মিস খেয়াল করেননি প্রথমটা, তারপর তিনি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, "তোমার কুকুর ? তুমি স্কুলে কুকুর নিয়ে এসেছ, আমার ক্লাসে কুকুর ছেড়ে দিয়েছ ? হাউ-ডেয়া-র..."

মিস এত উত্তেজিত যে কথা শেষ করতে পারলেন না। আমাদের স্কুলের সবচেয়ে রাগী টিচার। সবাই ভয়ে থরথর করে কাঁপে। উনি বললেন, "টিফিনে আমার সঙ্গে দেখা করবে। আজ ছুটির পর বাড়ি যাবে না। এক ঘণ্টা ডিটেনশান।"

মানে আমাকে এক ঘণ্টা আটকে থাকতে হবে। আমাদের ইংরেজির টিচার তখনও ক্লাস থেকে বেরোননি। তিনি সব শুনছিলেন। তিনিও মিস লাহার অগ্নিমূর্তি দেখে ঘাবড়ে গেছেন।

এই সময় ক্লাসের বাইরে থেকে একটা কিসের আওয়াজ শোনা গেল। মিস লাহা বললেন, "নিশ্চয়ই দ্যাট্ ডগ্।"

মোটেই তা নয়। আমাদের ক্লাসরুমের পেছন দিকে একটা দেওয়াল আছে, সেটা কাল থেকে ভাঙা হচ্ছিল। আজও সেটা ভাঙা হচ্ছে, ইটগুলো হুড়মুড় করে পড়ছে, তারই শব্দ। কিন্তু আজ ইস্কুলে যত গোলমাল হবে সব কিছুর জন্যই দায়ী আমি, মানে, আর্গোস। আমাদের ইংরেজির টিচার বললেন, "না, না, মিস লাহা, ওটা লোকজনের কাজের আওয়াজ।"

মিস লাহা বললেন, "আই নো, আই নো।"

আমাদের ইস্কুলের মালীরা অনেক সময় এখানকার দুধওলাদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে মাঠে গোরু আনতে দেয়। বিশেষ করে গির্জার পেছনে বেশ যেখানে জংলি জায়গা আছে। একটা ষাঁড় হেলতে-দুলতে সেইদিক থেকে আসছিল মাঠের মধ্যে দিয়ে। আমাদের ইংরেজির টিচার বললেন, "মিস লাহা, খোঁজ করে দেখুন কোনও ছাত্রী ষাঁড়টাকে নিয়ে আসেনি তো। বলা যায় না, ষাঁড়টা যদি কারও ক্লাসে ঢুকে পড়ে।"

মিস লাহা কটমট করে তাকিয়ে বললেন, "আপনি বেশ মজা পাচ্ছেন মনে হচ্ছে ?" চিৎকার করে বললেন, "চৌকিদার, চৌকিদার !"

চৌকিদার তখন কোথায় কে জানে ! মিস লাহা আর-একবার আমার দিকে তাকিয়ে গটগট করে হেঁটে গেলেন।

টিফিনের সময় সবাই মাঠে খেলছে। আমি আস্তে-আস্তে টিচার্সরুমের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার সঙ্গে-সঙ্গে মমতা আর প্রতিমা এসেছিল। দূরেই ছোট মেয়েরা সুর করে গাইছে—

অক্কং বক্কং বম্বে বো
আশি নব্বই পুরে শ'
শ' সে নিকলা ধাগা-আ
চোর নিকালকে ভাগা-আ

আমাদের ইংরেজির টিচার বসে চা খাচ্ছেন। আমাকে দেখতে পেয়েই ভেতরে ডাকলেন। আমি ঢুকে দেখলাম মিস লাহা কোথাও নেই। আরও চার-পাঁচজন টিচার বসে গল্প করছেন। একজন বলছেন, "ইয়া বড় কুকুর, লকলকে জিভ। প্রিন্সিপালের ঘাড়ের ওপর পা তুলে দাঁড়াল।"

ইংরেজির টিচার জিজ্ঞেস করলেন, "তাই নাকি, আপনি দেখেছেন ?"

"হ্যাঁ, আমার সামনেই তো হল। প্রিন্সিপাল তো দরজা বন্ধ করে বসে আছেন। পুলিশে টেলিফোন করেছেন।"

আর-একজন বললেন, "চৌকিদার কুকুরটাকে ধরে পুকুরে চুবিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। কী দুষ্টু মেয়ে সব আজকাল।"

আমি ততক্ষণে কেঁদে ফেলেছি, "চৌকিদার আমার কুকুরকে মেরে ফেলেছে !"

"তোমার কুকুর !" একজন টিচার জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ," আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, কিন্তু সে তো ইয়া বড় কুকুর নয়। সে তো ছোট..."

"তবে যে মিস লাহা বললেন, কুকুরটা কার কমলালেবু খেয়ে নিয়েছে, ক্যান্টিনে ঢুকে কার পায়ে কামড়ে দিয়েছে..."

যত সব বাজে কথা। কুকুর কখনও কমলালেবু খায়।

এমন সময় প্রিন্সিপাল ঢুকলেন। বেশ হাসি-হাসি মুখ। সবাই চুপ হয়ে গেল। সামনের চেয়ারে বসে আমাকে দেখে বললেন, "কী ব্যাপার, কাঁদছ কেন ?"

ঝড়ের বেগে মিস লাহা ঢুকে বললেন, "এই যে, দিস ইজ দ্য গার্ল।"

আমি তখন কাঁদতে কাঁদতে বলছি, "আমি আর করব না।"

প্রিন্সিপাল অবাক হয়ে বললেন, "কী করবে না ? মিস লাহা, আপনি কী বলছেন ? মিস লাহা, ওই যে কুকুর এনেছিল ক্লাসে..."

আমি ভাবছি, এইবার আমাকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে।

প্রিন্সিপাল বলে উঠলেন, "তোমার কুকুর ? ওয়ান্ডারফুল, খুব ভাল !"

"অ্যাঁ।" আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মিস লাহার ভুরু কুঁচকে গেল, "যে কুকুর আপনার ঘাড়ে লাফিয়ে উঠেছিল..."

প্রিন্সিপাল বললেন, "কী বলছেন, আপনি ?" আর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার কুকুর ইজ রিয়েলি গ্রেট। কাঁদছ কেন ?"

আমি তখনও বুঝতে পারছি না কিছু !

"এখানে এসো," প্রিন্সিপাল আমাকে কাছে ডাকলেন, "ভয় নেই। কুকুরকে দেখতে পাচ্ছ না বলে কাঁদছ ? হি ইজ সেফ। চিন্তা নেই।"

"আমি আর কখনও আনব না। কুকুরটা খুবই পাজি," আমি বললাম।

"অবশ্য আনবে, আমরা একসঙ্গে ফোটো তুলব," প্রিন্সিপাল বললেন।

মিস লাহা বললেন, "ফোটো ? ফোটো উইথ এ ডগ ?"

"হ্যাঁ। তোমার কুকুর হিরোইক।"

আমি বললাম, "আমার কুকুরের নাম আর্গোস। হিরোইক নয়।"

প্রিন্সিপাল হেসে বললেন, "হিরোইক মানে হল বীরের মতো কাজকর্ম। তোমার কুকুরকে তাই হিরোইক বললাম।"

এর পর প্রিন্সিপাল যা বললেন তা আমি অবাক হয়ে শুনলাম। মিস লাহার চোখ দুটো ছানাবড়ার মতো হয়ে উঠল। শুধু আমাদের ইংরেজির টিচার মুচকি-মুচকি হাসতে লাগলেন। আমাদের ইস্কুলের সামনের রাস্তায় খুব ভিড়। রাস্তার উলটো দিকে ফার্নিচারের দোকান অনেক। অনেক ওষুধের দোকান। পাশেই বড় হাসপাতাল কিনা। সব সময় গাড়ি-ঘোড়া। ইস্কুলের গেট তাই সব সময় বন্ধ রাখা হয়। শুধু কারও গাড়ি-টাড়ি এলে দরোয়ান খুলে দেয়, আবার সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হয়। আজ ইস্কুলের মধ্যে লরি এসেছিল দুটো, ইট-সিমেন্ট এই সব নিয়ে। ওই যে সেই দেওয়াল ভাঙার কথা বলেছি না, সেইখানে আসলে একটা তিনতলা বাড়ি উঠছে। সেইজন্য লরি আসে মধ্যে-মধ্যে। দরোয়ান গেটটা বন্ধ করেনি। ভেবেছে লরিগুলো বেরিয়ে গেলে বন্ধ করে দেবে। আজ কেন জানি না ক্লাস ওয়ানের তাড়াতাড়ি ছুটি হবার কথা ছিল। অনেকের মা-বাবা বাচ্চাদের নেবার জন্য গেটের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। একটা পুঁচকে মেয়ে হঠাৎ দৌড়ে মা-র কাছে যাচ্ছিল আর ধাঁ করে একটা মোটরগাড়ি এসে পড়েছে রাস্তায়। প্রিন্সিপাল কাউকে যেন এগিয়ে দেবার জন্য গেট পর্যন্ত এসেছিলেন। তাঁর চোখের সামনে। তিনি চেঁচিয়ে ওঠার সময় পাননি। মেয়েটির মাও হকচকিয়ে গেছেন। মোটর গাড়িটা খুব জোরে ব্রেক কষেছে। কিন্তু মেয়েটা তখন গাড়ির চাকার সামনে।

এমন সময় হঠাৎ শাঁ করে একটা সাদা কুকুর, মানে আমাদের আর্গোস, মেয়েটার কোমরের বেল্ট কামড়ে ধরে টান দিয়েছে। গাড়ির ঠিক চাকাটার সামনে থেকে মেয়েটা দু-তিন ইঞ্চি দূরে পড়ে গেল। আর আর্গোস ছিটকে পড়েছে গেটের ওপর। মেয়ের মা আর প্রিন্সিপাল দু'জনে দৌড়ে গিয়ে মেয়েটিকে তুললেন, মাথাটা একটু কেটে গেছে, কিন্তু মেয়েটির বেশি লাগেনি। ততক্ষণে রাস্তার লোকজন জমে গেছে। লরির কুলিরাও ছুটে এসেছে।

তারপর প্রিন্সিপাল দেখলেন গেটের লোহার ওপর শুয়ে পড়ে আর্গোস কাতরাচ্ছে। পায়ের কাছে রক্ত। মেয়েটিকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর আর্গোসের পায়ে আয়োডিন দিয়ে তুলো জড়িয়ে দিয়েছেন।

এক্ষুনি মেয়ের মা ফোন করে জানিয়েছেন যে মেয়েটি সুস্থ। কাটাটা সামান্য। আর্গোস প্রিন্সিপালের ঘরে বসে আছে।

"ইউ হ্যাভ এ ওয়ান্ডারফুল ডগ, সুজাতা," প্রিন্সিপাল বললেন, "আজ একজনের প্রাণ বাঁচিয়েছে। নিজের লাইফ তুচ্ছ করে। আমি ওকে প্রাইজ দেব। কাম, আমার সঙ্গে এসো। চলো, আমার ঘরে।"

আমি প্রিন্সিপালের ঘরের দিকে চললাম। আমাদের ইংরেজির টিচার আমার চুলের ঝুঁটিতে টান দিয়ে বললেন,

"মেরি হ্যাড এ লিটল ডগ হোয়াইট অ্যাজ স্নো
এভরি হোয়্যার দ্যাট মেরি ওয়েন্ট দি ল্যাম ওয়াজ সিওর টু গো।"

মিস লাহা হাতের ব্যাগটা জোরে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেললেন।

॥ নয় ॥

প্রিন্সিপালের ঘরে ঢুকে দেখি টেবিলের পায়ার সঙ্গে দড়ি দিয়ে আর্গোস বাঁধা। ওর পেছনের পায়ের ওপর তুলো জড়ানো পট্টি। সেটা লাল হয়ে উঠেছে। বোধ হয় এখনও রক্ত বেরোচ্ছে। আমি গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আর্গোসকে জড়িয়ে ধরলাম। আর্গোস আমার গাল চেটে দিল। ওর যে সেই ট্যারা চোখ, যেটা টনটন করে, সেই চোখটাকে খুব করুণ লাগল। আর্গোস উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু একটা আর্তনাদ করে আবার বসে পড়ল। আমি ওর মাথায় হাত বোলাতে লাগলাম।

প্রিন্সিপাল বললেন, "তোমার কুকুর আমার ইস্কুলের মান বাঁচিয়েছে। একটি মেয়ের প্রাণ বাঁচিয়েছে। আই অ্যাম প্রাউড অব ইয়োর ডগ। তুমি চিন্তা কোরো না। আমি সব দেখছি।"

আমাদের ইস্কুল থেকে কিছু দূরেই একটা পশুদের ডাক্তারখানা। প্রিন্সিপাল চৌকিদারকে ডেকে বললেন, "ইস্কুলের ছোট ভ্যানটা বার করতে বলো।"

একটু পরেই প্রিন্সিপালের সঙ্গে আমি আর একটি চাপরাশি এসে পৌঁছলাম একটা সরু রাস্তার ধারে। গাড়ি থেকে নেমে আর্গোসকে কোলে করে আমি প্রিন্সিপালের পেছন-পেছন হাঁটতে লাগলাম। সরু রাস্তাটা গিয়ে শেষ হল যেখানে সেখানে একটা কাঠের বাড়ি—তার ওপরে লেখা আছে ইংরেজিতে 'অ্যানিম্যালস ফ্রেন্ড'। সামনে একটা ছোট বাগান, আধখানা চাঁদের মতো। সেখানে একজন বুড়ি ইংরেজ একজন লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। প্রিন্সিপালকে দেখে তিনি এগিয়ে এলেন, তারপর ইংরেজিতে কীসব কথা হল। আমি বুঝলাম আর্গোসকে নিয়েই কথা হচ্ছে। বুড়ি আমার কাছে এসে হিন্দিতে বললেন, "আমার সঙ্গে ভেতরে এসো।" তারপর আর্গোসের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ব্রেভ ডগ্।"

ভেতরে গিয়ে দেখি একজন লোক একটা কুকুরকে শুইয়ে ইনজেকশান দিচ্ছে। কুকুরটার মুখে একটা কালো জাল। আর দু' জন লোক তাকে ধরে রেখেছে। পাশেই একটা জানালা। জানালা দিয়ে দেখলাম দূরে একটা সুন্দর ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। এখানে তা হলে ঘোড়ার চিকিৎসাও হয়। কুকুরের ইনজেকশানের পর ইংরেজ বুড়ি ডাক্তারকে বললেন আর্গোসের কথা। আর্গোস কিছুতেই ডাক্তারের টেবিলের ওপর উঠবে না। ভৌ-ভৌ করতে লাগল। ডাক্তার জোর করে চেপে ধরে আর্গোসের সামনের পা আর পেটের নীচে একটা থার্মোমিটার গুঁজে দিলেন। কুকুরদের যে থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর মাপে তা আমি জানতাম না।

কিছুক্ষণ পরে থার্মোমিটার বার করে ডাক্তার জানালার ধারে গিয়ে দেখলেন। তারপর আর্গোসের পাটা টিপে-টিপে দেখলেন। আর্গোস চেঁচিয়ে উঠল। ইংরেজবুড়ি গিয়ে আর্গোসকে চেপে ধরে বলতে লাগলেন হিন্দিতে, "আভি ঠিক হো জাওগে বেটা। তুম আচ্ছে লড়কে হো। ডরো মাত।"

ডাক্তার বললেন, "ভয়ের কিছু নেই। একটা হাড় বোধ হয় ভেঙেছে। ওকে ক্রেপ ব্যান্ডেজ করে দিতে হবে।"

প্রিন্সিপাল চাপরাশিকে পাঠিয়ে কাশ্মিরি গেটের দোকান থেকে ক্রেপ ব্যান্ডেজ আনালেন। ঘণ্টা খানেক পরে আর্গোসকে নিয়ে আমি বাড়ি পৌঁছলাম। সঙ্গে আমাদের প্রিন্সিপাল। ততক্ষণে হইচই হচ্ছে। সকাল থেকে আর্গোস নিখোঁজ। আর আমি ইস্কুল থেকে ফিরিনি। মমতা এসে বাড়িতে খবর দিয়েছে যে আমাকে স্কুলে একঘণ্টা আটকে রাখা হবে। আমাকে দেখে মা একটা বক্তৃতা দিতে শুরু করছিলেন কিন্তু সঙ্গে প্রিন্সিপালকে দেখে চুপ করে গেলেন।

প্রিন্সিপাল মাকে আর্গোসের বীরত্বকাহিনী শোনালেন চা খেতে-খেতে। আর্গোস সারাদিন কিছু খায়নি। চুকচুক করে দুধ খেয়ে ভালমানুষের মতো মা'র পায়ের কাছে বসে রইল। পেছনের পায়ে ক্রেপ ব্যান্ডেজ তাই একটু অস্বস্তি হচ্ছিল বোধ হয়।

পরের দিন ইস্কুলে আমি হিরো।

বাসে সর্দারজি বলল, "বাহাদুর কুত্তা।"

এখন থেকে দশ বছর পর ওদের কথা ভাবুন।

ভরা স্বাস্থ্যের ঝলমলে এক ছবি। দেখে আপনি গর্ববোধ না ক'রে পারবেন না। কারণ ওদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য মা হিসেবে এখন থেকেই আপনি ওদের জন্য সবকিছু ক'রে চলেছেন।

আপনার বুকভরা স্নেহ ভালবাসার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো, ওদের সঠিক পুষ্টি বিধান।

"হ্যাঁ, হরলিকসের পুষ্টি। বাড়ন্ত বয়সের প্রকৃত পুষ্টি। সুস্বাস্থ্য ও সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য হরলিকসে আছে অতি প্রয়োজনীয় সব পুষ্টি উপাদান –প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল ও কার্বোহাইড্রেট।

তার সঙ্গে আছে, শক্ত দাঁত ও মজবুত হাড়ের জন্য অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম।

তাইতো, বাড়ন্ত বয়সের বাচ্চাদের স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য চাই হরলিক্স।"

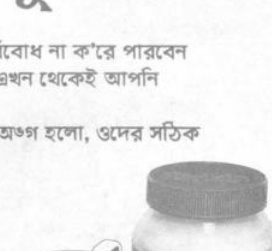

পুষ্টি যোগাতে অদ্বিতীয়

HTA 6223 BEN

রুচি চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ছড়া কাটতে শুরু করল—

সুজাতা হ্যাড় এ লিটল ডগ ব্ল্যাক অ্যাজ এ ক্রো

আমি কিছুই বললাম না, আমার ওসব কথায় কিছু এসে যায় না।

কিন্তু আর্গোসের পা-টা ঠিক হল না। প্রিন্সিপাল প্রত্যেক দিন খোঁজ নিতেন। পায়ের ঘা শুকিয়ে গেল কিন্তু আর্গোস ঠিক আগের মতো করে পা ফেলতে পারল না। একটা কোথায় খুঁত থেকে গেল। চট করে বোঝা যায় না, কিন্তু একটু ভাল করে দেখলেই বুঝতে পারতাম যে আর্গোস একটু খোঁড়ায়। আমার কষ্ট হত। আগের মতো দৌড়য় ঠিকই, কিন্তু একটু কষ্ট হয়। অত স্পিড নেই। প্রিন্সিপাল বলতেন, "বড়-বড় যোদ্ধাদের গায়ে কত ক্ষতচিহ্ন থাকে,অস্ত্রের দাগ থাকে। তোমার কুকুর বীর। তাই ওর পায়ে ওই ক্ষতচিহ্ন।"

একদিন সেই যে মেয়েটি—যাকে আর্গোস বাঁচিয়েছিল, সে তার মা আর বাবার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এল আর্গোসকে দেখতে।

সেদিন আমরা একসঙ্গে একটা ফোটো তুললাম। ছোটদা, আমি, সেই মেয়েটি আর মাঝখানে আর্গোস। আমার পাশে একটা মোড়ার ওপর বসে আছে। দেখলে মনে হয় সত্যি-সত্যি বীরপুরুষ। মা বলেন, ছিল ট্যারা, এখন হল খোঁড়া। কিন্তু আসলে তো এখন ও বীর। হোক ট্যারা, হোক খোঁড়া, ক'টা মানুষ আর-একজনের জন্য এমন করে প্রাণ দেয়।

আমি রোজ মাঠে নিয়ে যাই আর্গোসকে। এখন আর ও প্রজাপতির পেছনে দৌড়য় না। মালীদের ছেলেদের সঙ্গে খেলে। আমি যেই জিজ্ঞেস করি, "পায়ে লাগছে ?"

আর্গোস লাফিয়ে ওঠে, দু'পা তুলে দাঁড়ায়। ঠিক যেন ভোঁদড়। না, যেন ঠিক বড় একটা খরগোশ। আর্গোস-খরগোশ।

॥ দশ ॥

সেবার ঠিক হল আমরা পুজোর সময় মাসিদের বাড়ি যাব মুরাদনগরে। মুরাদনগর দিল্লির কাছেই। ঘণ্টা দেড়েকের রাস্তা। ট্রেনে পৌনে দু' ঘণ্টা ! বাসে দেড় ঘণ্টা। ওখানে একটা দুর্গাপুজো হয়। বাবা যাবেন না, দিল্লিতেই থাকবেন। ঠিক হল আর্গোসও থাকবে। আর্গোসের কাজ হল বাড়ি পাহারা দেওয়া।

আচ্ছা, এটা কেমন বিচার। ও বেচারা কেন একা-একা থাকবে সারাদিন। বাবার সঙ্গে কথাবার্তা ওর জমে না। বাবা তো বেশি কথাও বলেন না। ওকে ফেলে আমরা সবাই পুজো দেখতে যাব। মা বললেন, "কিন্তু আর্গোসকে নিয়ে যাবি কী করে ? ট্রেনে উঠতে দেবে না, বাসে উঠতে দেবে না।" বা, তাই বলে ও যাবে না। মাসিকে তো ও চেনে। চাঁদুদা, মানে আমার মাসতুতো দাদা, তার সঙ্গেও ওর ভাব। গতবার খুবই বন্ধুত্ব হয়েছিল ওর। আর্গোসেরও তো ইচ্ছে বলে একটা ব্যাপার আছে ! মাসি সোয়েটার বোনেন ভাল। আমার ইচ্ছে ওর মাপ মতো একটা সোয়েটার বুনিয়ে নেওয়া মাসিকে দিয়ে। ওর কতটুকু শরীর। মাসি একটু ইচ্ছে করলেই একদিনে আর্গোসের জন্য একটা বুক খোলা সোয়েটার বুনে দিতে পারেন।

আমি বললুম, "ঠিক আছে, আমিও যাব না।"

মা বললেন, "তুমি থাকবে একা-একা ?"

একা-একা কেন ? বাবা, রানিদি রানিদি আমাদের বাড়িতে কাজ করে, আর্গোস, এত লোক আছে।

ছোটদা এসে খবর দিল মুরাদনগর থেকে লোকজন আসছে দিল্লিতে একটা লরি নিয়ে। লরি নিয়ে কেন ? ঠাকুর নিয়ে যেতে হবে তো। সেই লরিতে আমরা—মানে ছোটদা আর আমি যেতে পারি, আর্গোসও চলে যাবে আমাদের সঙ্গে। মা অগত্যা রাজি হলেন।

আমরা বেশ মজা করেই লরিতে চেপে মুরাদনগরে পৌঁছলাম। এখানে আছে একটা অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি। তার কর্মচারীদের জন্য থাকার বাড়ি, ইস্কুল, হাসপাতাল, খেলার মাঠ। আর ফ্যাক্টরি ছাড়ালেই শুধু মাঠ আর মাঠ। দূরে দূরে ছোট-ছোট গাঁ। এইসব মাঠে সরষে আর আখ। পাকা রাস্তা শেষ হলেই আরম্ভ হয় মাঠ, আর মাঠ আর মাঠ। মনে হয় পৃথিবীতে আর কিছু নেই। এখানে বিকেল বেলা আর্গোস আর আমি আর মাসির বন্ধুদের কয়েকটি ছেলেমেয়ে রোজ বেড়াতে যেতাম। কোথাও কোনও লোকজন নেই। হঠাৎ হয়তো গাঁয়ের কোনও পাগড়ি-বাঁধা বুড়ো লাঠি হাতে কাঁধে ঝোলা নিয়ে দেখা দিত। কদাচিৎ কখনও একটা সাইকেল। তা না হলে শুধু হাওয়ার শব্দ, আর পাখির শব্দ।

ওখানে যাবার দু' দিন পরে আর্গোসকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছি। বেশিদূর যাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বিকেলটা সেদিন এত সুন্দর, রাস্তাটা এত নির্জন, চারদিকে এত ছায়া যে আস্তে-আস্তে এগোতে-এগোতে চলে এসেছি মাঠের ধারে। বেশ দূরে একটা মসজিদ দেখা যাচ্ছিল। মাঠের মাঝখানে একটা শুকনো খাল। আর্গোস মজায় দৌড়তে শুরু করল খাল পেরিয়ে। কাজেই ওকে ধরার জন্য আমিও ছুটলাম। খালের ধার দিয়ে একটা পায়ে-চলা রাস্তা। সেখানে দেখি দু'জন লোক আসছে একপাল ভেড়া নিয়ে। এত ভেড়া আমি একসঙ্গে কখনও দেখিনি। আর্গোসকে আমি ধরে রাখলাম। দু'-একটা ভেড়া এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছিল দেখে একটা লোক লাঠি হাতে তাদের হ্যাট-হ্যাট করতে করতে এক লাইনে আনার চেষ্টা করতে লাগল। তাদের লাঠি দেখে আর্গোস ভয় পেল কি না জানি না, হঠাৎ আমার হাতের লিস ছাড়িয়ে সেই ভেড়ার পালের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আর্গোসের চেহারাটা খুব বড় নয়, আবার খুব ছোট নয়, কাজেই তাকে দেখাচ্ছিল যেন এক ছোট ভেড়ার বাচ্চা, শুধু তার শিং নেই, আর গায়ের রং সাদা। প্রথমটা আমি বুঝতে পারছিলাম সে কোন দিকে যাচ্ছে, আর ভেড়ার পাল তাকে দেখে ব্যা-ব্যা শব্দ করতে করতে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবার চেষ্টা করছে, আর তাদের খুরের ধাক্কায় মাটি থেকে ধুলো উঠে একটা মেঘ তৈরি করেছে, আর আলো নিভে আসছে। আমি অবশ্য এক-আধবার ভৌ-ভৌ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, আর তার আওয়াজ শুনে দূরে কোনও কুকুরও ডাকছে, আর ভেড়াগুলো একসঙ্গে ভয়ে না মজায় ব্যা-ব্যা করছে। আমি হতবম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার চোখের সামনে সেই ভেড়ার দল হু হু করে এগিয়ে যাচ্ছে। ঠিক যেন হাওয়া লেগে মেঘ উড়ে চলেছে। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, "আর্গোস।" একটা ভৌ-ভৌ আওয়াজ শুনলাম আর ঠিক তার নকল করে কে যেন ভৌ-ভৌ করে ডেকে উঠল। আমি ভেড়ার পালের আশেপাশে ছুটতে লাগলাম আর লোকগুলোকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আমার কুকুরটা গেল কোথায় ?"

একজন দেহাতি হিন্দিতে বলল, একটা কুকুর মাঠের ওই রাস্তা ধরে চলে গেছে, বলে আঙুল দিয়ে দেখাল। যেদিকে আঙুল তুলে দেখাল, সেদিকটায় ঘন জঙ্গলের অন্ধকার, সূর্যের একটু আলো তার মাথার ওপর ঝকমক করেছে। আমি যে ভেড়াগুলোর ভেতর দিয়ে রাস্তার ওপারে যাব তার উপায় নেই। যখন ভেড়ার পাল চলে গেল, তখন রাস্তায় আমি একা, সমস্ত মাঠে অন্ধকার। বাড়ি থেকে অনেক দূরে এসেছি।

আমার এবার মনে পড়ল চাঁদুদা বলেছিল এইসব অঞ্চলে অনেক সময় ডাকাতি হয়। তবে এই মাঠের মধ্যে ডাকাত আসবে কেন ? ডাকাতরা তো কোনও বড় লোকের বাড়িতে লুটপাট করতে যায়।

এখানে ছোট-ছোট গাঁ, থাকে গরিব লোকেরা, সেখানে ডাকাতি করে কী হবে ? তবে বলা যায় না কিছু। ডাকাতরা তো অনেক সময় গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। আমার ভয় করতে লাগল। আমি চিৎকার করে ডাকলাম,"আর্গোস।"কোনও সাড়া নেই, শুধু একটা হাল্কা প্রতিধ্বনি হল। আমার গা শিরশির করে উঠল ভয়ে। আমি এবার উলটো দিকে ছুটতে শুরু করলাম। ঠিক সন্ধের পরই গ্রামের রাস্তায় অন্ধকারটা বেশি ঘন হয়। আমি অন্ধকারে বোধ হয় ভুল রাস্তাতেই চলে এসেছি।

একবার দাঁড়ালাম। আবার চলতে আরম্ভ করলাম। হঠাৎ যেন শুনলাম একটা শব্দ। খটখট শব্দ। কেউ আসছে নাকি পেছনে-পেছনে। কিন্তু অন্ধকারে কাউকে তো দেখতে পেলাম না।

একবার বললাম, "কৌন হ্যায় ?"

নিজের গলাটা নিজের কানেই অদ্ভুত শোনাল। রাত্রিবেলা পৃথিবী যে এত অন্ধকার তা তো আমি আগে কোনওদিন জানতাম না।

আবার শব্দ হল খটখট খটখট। কী যেন ছুটে আসছে। বেশ কাছে আসতে মনে হল একটা জন্তু। কিন্তু তখন আমার এমন ভয় হচ্ছে যে, ছুটতে আরম্ভ করলাম। হঠাৎ জন্তুটা ডেকে উঠল। বিকট আওয়াজ। আওয়াজ শুনে মনে হল একটা গাধা। আর তার পেছনে আরও একটা কিছু। হয়তো লোক, হয়তো অন্য কোনও গাধা। আমি হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। আর তারপর আমার কোনও জ্ঞান ছিল না। শুধু যখন ঘাসের ওপর পড়ে যাচ্ছিলাম, দেখলাম আকাশ থেকে অনেক তারা ঝরে-ঝরে পড়ছে, আর আমার চোখটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

যখন আমার জ্ঞান হল তখন দেখি চারপাশে লোক। তাদের কারও হাতে হ্যারিকেন, কারও হাতে টর্চ। আস্তে-আস্তে মুখগুলো স্পষ্ট হল। মেসো, চাঁদুদা, ছোটদা, চাঁদুদার বাড়ির পাশে থাকেন বিমলবাবু, সবাই 'বিমলদা' বলে, নাটক করেন, আরও দু'জন লোক, আমি তাদের চিনি না। মেসো আমার চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছেন। আর বলছেন, "এই তো চোখ মেলেছে, ভয় নেই।"

আমি উঠে বসলাম। তখন দেখি সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর্গোস। আমাকে বসতে দেখেই ভৌ-ভৌ করে উঠল। আমার এমন রাগ হল আর্গোসকে দেখে। ওর জন্যই তো! ছোটদা বলল, "উঠে দাঁড়াতে পারবি ?"

আমি আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। না, কোনও কষ্ট নেই শরীরে।

মেসো বললেন, "একটু হেঁটে যেতে পারবে, না কোলে করে নেব ? বলেই কোলে তুলে নিলেন। আমি খুব আপত্তি করলাম না। একটু হেঁটেই মেসো দেখলেন ওই যে একটা সাইকেল রিকশ দাঁড়িয়ে আছে। বিমলবাবু একটা সাইকেল রিকশ জোগাড় করে এনেছেন। মেসো বললেন, "চাঁদু উঠে বোস, আর্গোসকেও তুলে নে।"

আমি বললাম, "হতভাগা আর্গোসকে আমি চাই না।"

ছোটদা বলল, "খুব রাগ দেখাচ্ছিস আর্গোসের ওপর। ও না থাকলে মাঠে পড়ে থাকতিস।"

আমি বললুম, "ওর জন্যই তো।"

মেসো বললেন, "ওই আমাদের খবর দিলে। ওই তো রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে এল আমাদের।"

কী শয়তান। ওর জন্যই তো আমার এই অবস্থা। ও আবার ভালমানুষ সেজে বাড়ি গিয়ে সবাইকে ডেকে এনেছে।

যাই হোক ছোটদা, চাঁদুদা আর আমি উঠলাম রিকশয়। পেছনে অন্য সবাই। আর্গোস আমাদের পাশে-পাশে দৌড়ে চলল। কত রাত হয়েছে জানি না, কিন্তু তখন অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে, আকাশে একফালি চাঁদ উঠেছে। আমাদের বড়-বড় ছায়া পড়েছে রাস্তায়। আর্গোসের ছায়াটাকে সে মধ্যে-মধ্যে ভাল করে দেখছে, ছায়াটার সঙ্গে খেলা করতে চাইছে। ভাল রাস্তায় এসে রিকশ জোরে চলতে আরম্ভ করল।

বাড়ি ফেরার সঙ্গে-সঙ্গেই মা'র অর্ডার হল আমার রাস্তায় বেরনো বন্ধ। আমি রেগে আর্গোসকে একটা থাপ্পড় মারলাম।

মা বললেন, "ওর ওপর রাগ ফলানো হচ্ছে। দরকার হলে পায়ে শিকল বেঁধে রাখা হবে।" মা আর্গোসকে আদর করতে লাগলেন।

অকৃতজ্ঞ, শয়তান। তোর জন্য আমার এই শাস্তি।

মেসো বললেন, "তোমার কুকুরটার সত্যি ভারী বুদ্ধি। তোমার মাথার লাল ফিতেটা মুখে করে আনল বলেই তো..."

আমার লাল ফিতে ? মাথায় হাত দিয়ে দেখি সত্যিই তো নেই। আমার সেই সুন্দর লাল ফিতে। মা চেয়ারে বসে আর তার নীচে আর্গোস সেই লাল ফিতেটা নিয়ে টুকরো টুকরো করছে। আমার দিকে কোনও ভ্রুক্ষেপই নেই।

ছোটদা বললে, "কিন্তু তুই অজ্ঞান হলি কেন ? ভূতের ভয়ে ?"

আমি বললাম, "ভূত তুই!"

মা বললেন, "ঢের হয়েছে। এখন খেয়ে শুয়ে পড়ো। রাত সাড়ে এগারোটা।"

মেসো বললেন, "গুড ডগ।"

ওঃ, সকলেরই আর্গোসের দিকে টান। আমি যেন কিছুই নই। আমি যেন কেউ নই। আমি বললাম, "আমি খাব না। আমার ভাল লাগছে না।"

মাসি বললেন, "না, না। একটু খেয়ে নে। কাল ষষ্ঠী। আমাদের এখানে সিনেমা হবে, কাল তোকে নিয়ে যাব।"

॥ এগারো ॥

দু'দিন আর্গোস আমার কাছেই এল না।

সেই যে থাপ্পড় মেরেছিলাম তাতে আবার ওঁর রাগ হয়েছে। থাপ্পড় মারবে না তো কি পুজো করবে!

কিন্তু আস্তে-আস্তে আমার রাগ পড়ে যাচ্ছিল। ও তো আমার ফিতেটা এনে বাড়িতে দেখিয়েছে, রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গেছে। তা না হলে হয়তো আমি সারারাত ওই মাঠেই পড়ে থাকতাম। বাব্বা! সাপ-টাপ যদি কামড়াত কিংবা যদি ওই রাস্তায় ডাকাত আসত। না, না, আর্গোস আমার উপকারই করেছে। কিন্তু ওই সুন্দর লাল ফিতেটা চিবিয়ে, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলাটা কোন দেশী ভদ্রতা শুনি! একটা থাপ্পড় মেরেছি তো কী হয়েছে। মা তো আমায় কত সময় থাপ্পড় মারেন। মারেন না ? তা আর্গোস, তুই তো একটা কুকুর, তুই তো ইস্কুলে যাস না, অঙ্ক জানিস না, সোশ্যাল সায়েন্স পড়িস না, ইংরেজি জানিস না, তোর অত রাগ কিসের রে!

নবমীর দিন রাত্রে এখানে নাটক। বিমলদা, সেই যে ভদ্রলোক, সেদিন রাত্রে মেসোর সঙ্গে আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, তাঁর ডিরেকশান। বিমলদা মোটাসোটা লোক, সব সময় চেঁচিয়ে কথা বলেন। তিনি মাসিকে বলে গেছেন সবাই সকাল-সকাল যেন পৌঁছে যাই, ঠিক ন'টার সময় নাটক শুরু হবে।

আটটার সময় খেয়েদেয়ে, সেজেগুজে, মুখে পাউডার-টাউডার মেখে আমরা বেরোলাম নাটক দেখতে। পাক্কা এক ঘণ্টার পর বিমলদার গলা শোনা গেল মাইকে, আর-একটু পরেই নাটক শুরু হচ্ছে। আমার ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল। মাসি বললেন, "চল, সামনে শতরঞ্জিতে বসি। ওইখানে আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমোবি।"

আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছি। যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি চারদিকে বেশ ভিড়। নাটকও শুরু হয়ে গেছে। আমার নাটক ভাল লাগছিল না। এই নাটকে চাঁদুদা অভিনয় করছে। মাসিকে বললাম, "চাঁদুদা এলেই ডেকে দিও।"

আবার শুয়ে পড়ব ভাবছি তখন দেখি খাড়া-কান, সাদা-লোম কী যেন একটা শাঁ করে বেরিয়ে গেল স্টেজের পেছনে।

আমি মাসিকে জিজ্ঞেস করলাম, "আর্গোস তো বাড়িতেই বাঁধা আছে?"

মা ধমক দিয়ে বললেন, "সব সময় আর্গোস। বাড়িতে থাকবে না তো কি অভিনয় করবে? বাড়িতেই আছে!"

আমি বললাম, "না, বেঁধে রেখেছ কি? আমি যেন আর্গোসকে ওই দিকে যেতে দেখলাম।"

মা বললেন, "বেঁধে রাখব কেন?"

পেছন থেকে এক ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, "অত কথা কইছ কেন খুকি। চুপ করে দ্যাখো, নয়তো ঘুমোও।"

মা একবার পেছন ফিরে তাকালেন। আমিও চুপ করে গেলাম।

ব্যাটা আর্গোস, কোন ফাঁকে এখানে চলে এসেছে। স্টেজের পেছনে গেল কেন? ওখানে নিশ্চয়ই ছোটদা আর চাঁদুদা আছে। ওদের কাছেই এসেছে। আচ্ছা, তোর এখানে আসার কী দরকার। তুই নাটকের কী বুঝিস! সেই যে ভদ্রমহিলা, তাঁর পাশে এক বেঁটে মতো বুড়ো গান্ধীটুপি-পরা, খুব হাততালি দিয়ে উঠলেন। আমিও হাততালি দিলাম আর মা আবার ধমক লাগালেন, "চুপ চুপ।"

"বোকার মতো হাততালি দেবে না।" পেছনের সেই ভদ্রমহিলা বললেন।

"তা ছেলেমানুষের ভাল লেগেছে, হাততালি দিচ্ছে, দিক না বাছা। অত শাসনের দরকার কী?"

হঠাৎ মা মাসির গায়ে ধাক্কা দিয়ে বললেন, "ওই তো, ওই তো চাঁদু। আমি প্রথমটা বুঝতে পারিনি। সত্যি, চাঁদুদা—এক মুখ দাড়ি, গোঁফ। চুল এলোমেলো। মালকোঁচা মারা ধুতি। গায়ে কালো চাদর। চেয়ারে বসে আছে একজন লোক, তার মুখটা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। চাঁদুদা বলল, "বন্দেমাতরম।" সেই লোকটি বলল, "বন্দেমাতরম।" তারপর কীসব কথাবার্তা হল। চট্টগ্রাম-চট্টগ্রাম দু'বার শুনলাম। তারপর সেই লোকটি একটা পিস্তল বার করে চাঁদুদার হাতে দিল। বলল, "সাবধানে রেখো।" চাঁদুদা চাদরের তলায় ঢুকিয়ে নিল পিস্তল। চারদিক ছমছম করছিল। সেই লোকটি কী যেন বলল, চাঁদুদা তখন স্টেজের সামনে দাঁড়িয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিল। শেষে বলল, "উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই।" তখন আস্তে-আস্তে পরদা নামতে লাগল, সবাই খুব হাততালি দিল আর পেছনের সেই গান্ধীটুপি-পরা বুড়ো উঠে দাঁড়িয়ে বন্দেমাতরম বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। ভদ্রমহিলা তাঁর হাত ধরে বসিয়ে দিলেন, আর পেছন থেকে, কে একজন বলে উঠল, বিপ্লবী খেপে উঠেছে।

চারদিকে আলো জ্বলে উঠল। বাঃ, চাঁদুদা বেশ করছে। আমার ঘুম কেটে গেছে। আমি তখন ভাবছি এবার ওই পিস্তল দিয়ে চাঁদুদা কী করবে। ইংরেজদের মারবে বোধ হয়। সেই যে বুড়ো যাকে পেছন থেকে কে বিপ্লবী বলেছিল তিনি পান খেতে-খেতে বললেন, "আমার লাইফ—একেবারে এই লাইফ আমার।" তাঁর স্ত্রী ফিসফিস করে বলছেন, "চুপ করবে, নাকি উঠে যাব?"

আবার আলো নিভে গেল। পরদা উঠল। খাকি জামা-পরা পুলিশ দু'জন বসে আছে। তাদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। অস্ত্রাগার কথাটার মানে আমি জানি। এই সময় এক সাহেব

ঢুকল। সাদা রং, হলুদ চুল, সাদা প্যান্ট, কোমরে বেল্ট, তাতে রিভলভার বাঁধা। পায়ে ভারী বুট। একেবারে সত্যি সাহেব। সাহেব পুলিশদের বলল, "উহাকে লইয়া আইস।" বলে পায়চারি করতে লাগল। একটু পরেই পুলিশ দুটো চাঁদুদাকে নিয়ে ঢুকল। চাঁদুদার দুই হাত বাঁধা শিকল দিয়ে। চাঁদুদা ঢুকেই গান ধরল—"মোদের এই শিকল পরা ছল রে, মোদের শিকল পরা ছল, এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল।" চাঁদুদার গলা খুব ভাল। চারদিক গমগম করে উঠল। হঠাৎ সাহেব বলল, "স্টপ দিস। এই সব গান বন্‌ড করো।" আমি তো চমকে উঠেছি।

চাঁদুদা কী বললে ভাল শোনা গেল না। কারণ সাহেব ভীষণ চেঁচাচ্ছিল। একটু শুনতে পেলাম, "সাহেব, তোমাকে আমরা ভয় করি না। তুমি আমাদের ভয় করো।"

সাহেব হঠাৎ চাঁদুদার মুখের ওপর একটা ঘুসি মারল। সাহেব বলল, "টোমার জিভ কাটিয়া লইবে।"

চাঁদুদা বলল, "বন্দেমাতরম। ভারতবাসী মরতে ভয় করে না।"

সাহেব এবার চাঁদুদাকে একটা লাথি মারল। চাঁদুদা পড়ে গেল মাটিতে। সেই জায়গায় আলো পড়েছে গোল হয়ে স্টেজের অন্য দিকে ঝাপসা অন্ধকার। সাহেব হাহা করে হাসছে, আর দেখলাম চাঁদুদার কপাল থেকে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। চাঁদুদা বলছে, "এই রক্ত আমাদের মুক্তি। ভারতবর্ষের মাটি এই রক্ত চাইছে।"

আমরা তো সব একেবারে কান খাড়া করে শুনছি। সাহেব চাঁদুদার ঘাড় ধরে তুলে জিজ্ঞেস করল, "টোমাদের দলে আর কে কে আছে? টাহাদের নাম কী?"

চাঁদুদা বলল, "আমাদের দলে সমস্ত ভারতবর্ষ।"

সাহেব এবার চাঁদুদাকে একটা চড় মারল, "টুমি অট্টন্ট মূর্খ। আমি টোমার একটা কান ছিঁড়িয়া দিবে।"

আমার তো রক্ত গরম হয়ে উঠেছে। সাহেব আবার চাঁদুদাকে মারতে গেছে—কোথা থেকে স্টেজের ওপর একটা কুকুর। আর কেউ নয়, আমাদের আর্গোস। ভৌ-ভৌ করে লাফিয়ে উঠেছে স্টেজে। পুলিশ দুটো হতভম্ব। তারা কিছু করার আগেই আর্গোস সাহেবের প্যান্ট কামড়ে ধরেছে। সায়েব বেশ ঘাবড়ে গিয়ে চেঁচাচ্ছে—"অ্যাই, অ্যাই" বলে স্টেজের মধ্যে দৌড়তে লাগল।

পেছনের সেই গান্ধী-টুপি পরা ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে, "মারো ব্যাটাকে" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। আর চাঁদুদা প্রথমটা ঘাবড়ে গিয়ে, বলতে লাগল, "বললাম না, সমস্ত ভারতবর্ষ আমাদের দলে, শুধু ভারতবর্ষের মানুষ নয়, ভারতবর্ষের সমস্ত গোরু, সমস্ত কুকুর আমাদের দলে, বন্দেমাতরম।"

মাসি বললেন, "চাঁদু কী করছে বল দেখি।" চাঁদুদার বক্তৃতা চলছে, আর্গোস সাহেবের বেল্টটা ধরে টান মেরেছে। এমন সময় আলো নিভে গেল আর পরদাটা নামতে-নামতে আটকে গেল। আমরা দেখলুম, সাহেব ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে স্টেজ থেকে।

॥ বারো ॥

মাসি আর মা খুব হাসছেন। আমি কিন্তু হাসির কারণ বুঝলাম না। মা-র পাশে এক ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন, "কুকুরটাকে কে ট্রেনিং দিলে গা, আমাদের বিমল?"

আর একজন ভদ্রমহিলা, চোখে চশমা, খ্যাসখেসে গলা, বললেন, "বিমল কি দেবে ট্রেনিং।" আমার কত্তা, মিস্টার বিশ্বাসের কাছে বিমল এসেছিল, বলল যে কুকুরটাকে ট্রেনিং দিয়ে দিন সার। তা উনি তো কত কুকুর ঘেঁটেছেন। উনি বললেন, আচ্ছা এনো, দেখি কী করা যায়। ওই দিন-দুয়েক ট্রেনিং দিয়েছেন আর কি—দেকলে সে কী খেলা দেকালে।"

আমি তো শুনে অবাক।

অন্ধকারে কে যেন বললে, "মিস্টার বিশ্বাস বুঝি আগে কুকুরের ট্রেনার ছিলেন?"

মহিলাটি মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "কে? কে? মুখ সামলে কথা বলো।"

মাসি বললেন, "রাগ করছেন কেন মিসেস বিশ্বাস। ওরকম কথা কানে নিতে নেই।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "রাগ আবার কী। এসব কথা শুনলে আমার গা-পিত্তি জ্বলে যায়।

এইজন্য উনি বলেন, "বাঙালিদের নাটক-ফাটক দেখতে যাবে না। যত সব বাজে ব্যাপার। তখনই বলেছিলুম কুকুর-ফুকুর ট্রেনিং দিও না। এখন আবার আমাকে টোকা হচ্ছে।" আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই বুঝি তোমার বোনপো। কী গো মেয়ে, কেমন দেখলে, কুকুরটা কেমন করলে বলো দিকি। ওই কুকুরটা ছিল আগে জেমিনি সার্কাসে। তাই তো অত সহজে নাটক করতে পারলে।"

আমার চোখ ক্রমশ গোল হয়ে উঠল। আমি মাসিকে বললাম, "একটু আসছি।"

আস্তে-আস্তে স্টেজের পেছনে চলে গেলাম। কয়েকটা ছেলে বলল, "এখানে কী, এখানে কী?"

আমি বললাম, "চাঁদুদার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

তারা বললে, "এখন নয়, পরে।"

আমি দেখলাম, একটা ছেলে অনেক চায়ের কাপ নিয়ে একটা পরদা সরিয়ে বেরিয়ে এল। সে যেই বেরিয়েছে আমিও সেই পরদার ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়েছি। ঢুকেই দেখি একটা ঘেরা জায়গায় সেই সাহেবটা চেয়ারে বসে শিঙাড়া খাচ্ছে। বিমলদা সিগারেট হাতে নিয়ে চাঁদুদাকে ধমকাচ্ছে। আর ছোটদা আর্গোসকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সাহেব বলছে, "চাঁদু ইচ্ছে করেই করেছে।"

চাঁদুদা বলছে, "মাই গড। আমি জানতামই না যে আর্গোস এভাবে স্টেজের মধ্যে ঢুকে পড়বে।"

বিমলদা বললেন, "চাঁদু, ইউ মাস্ট অ্যাপলোজাইজ।"

আমি গিয়ে দাঁড়াতেই চাঁদুদা বলল, "এই যে, তোর গুণবান কুকুর কী কেলেঙ্কারি করল, দেখলি!"

আমি বললাম, "কেন, মিসেস বিশ্বাস বলছিলেন, মিস্টার বিশ্বাস নাকি কুকুরকে ট্রেনিং দিয়েছেন। বিমলদাই তো মিস্টার বিশ্বাসের কাছে ওই কুকুর নিয়ে গিয়েছিলেন ট্রেনিং দেওয়ানোর জন্য।"

চাঁদুদা আর সাহেব দু'জনে বললে, "বিমলদা, তুমি, ওই বিশ্বাসের কাছে—কী ব্যাপার..."

বিমলদা বললেন, "কে বলেছে?"

আমি বললাম, "কেন, মিসেস বিশ্বাস। মাকে আর মাসিকে বলছিলেন যে, কুকুরটা যে এত ভাল রোল করল, তার কারণ মিস্টার বিশ্বাসের ট্রেনিং। অন্য কেউ ভেবেছিলেন যে বিমলদার ট্রেনিং। তাই মিসেস বিশ্বাস বললেন, বিমল কী ট্রেনিং দেবে?"

বিমলদা বললেন, "হোয়াট? আমি পারি না, পারে মিস্টার বিশওয়াশ। হুঁ, আমাকে ডাই-রেক-শান দেওয়া শেখাচ্ছে।"

সাহেব বলল, "তা হলে কুকুর স্টেজে ঢোকানোর আইডিয়া তোমারই?"

বিমলদা বললেন, "শাট আপ।"

আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন, তখন দুটি ছেলে এসে বলল, "কী আইডিয়া, গুরু। অদ্ভুত, অদ্ভুত। পাবলিক খুব খুশি। অবাঙালি যারা আছে, ফ্যাক্টরির সব লোক, সবাই বলছে, হ্যাঁ, বিমলবাবু কা কামাল হ্যায়। কুত্তাকা জো রোল হ্যায় ওহ তো সব সে বঢ়িয়া হ্যায়।"

বিমলদা, সাহেব আর চাঁদুদা তিনজনেই অবাক হয়ে গেলেন। বিমলদা বললেন, "মানে, পাবলিক দৃশ্যটাকে মনে করেছে রিয়াল?"

"একেবারে, টপ, দাদা, টপ।"

বিমলদা আবার বললেন, "মানে পাবলিক ভেবেছে যে, সত্যি ওই কুকুরটার রোল ছিল?"

ছেলেটা বলল, "তবে কি ছিল না, নাকি?"

বিমলদা বললেন, "গুড গুড। না, আমি পাবলিক রিঅ্যাকশানটা জানতে চাইছি। হেঁ-হেঁ।" বিমলদা সাহেব আর চাঁদুর দিকে তাকালেন। "অল রাইট—তোমরা সব বাইরে যাও।" আর আমার দিকে তাকিয়ে বিমলদা বললেন, "শোনো, তুমি আর ছোটদা তোমরা দু'জনে মিলে তোমাদের এই প্রতিভাবান কুকুরটিকে নিয়ে বাইরে যাও।"

বিমলদা ঠাট্টা করলেন কি না বুঝলাম না। কিন্তু দেখলাম, ছোটদা আর্গোসকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। বাইরে আসার একটু পরেই শুনলাম মাইকে বিমলদার গলা, "আমাদের নাটকের শেষ অঙ্ক শুরু হচ্ছে। তার সঙ্গে একটি ঘোষণা। অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির জেনারেল ম্যানেজার নাট্যরসিক ভি ভি বালসামবা কুকুরের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে একটি রৌপ্য পদক দিতে অঙ্গীকৃত হয়েছেন। আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।"

চারদিকে প্রচণ্ড হাততালি পড়ল।

ছোটদা বলল, "ফ্রেঞ্চে কুকুরকে কী বলে যেন?"

আমি বললাম, "ঘোষালমশাই বলেছিলেন লা কুত্তো।"

ছোটদা বলল, "হ্যাঁ, আমাদের আর্গোস একটি লা কুত্তো।"

॥ তেরো ॥

বোধ হয় বছর দুয়েক পরে। ইস্কুল থেকে ফিরলাম জ্বর নিয়ে। মা কপালে হাত দিয়ে বললেন, "গা যে পুড়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়।"

আমি দাঁড়াতেই পারছিলাম না। শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল তখন সন্ধে হয়ে আসছে। আমাদের জানালা দিয়ে কলেজের মাঠের কিছুটা দেখা যায়। এইসময়

অন্য দিন আর্গোসকে নিয়ে বেড়াতে যাই। আজ তো আমার জ্বর। হয়তো ছোটদা নিয়ে গেছে। আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম, "ছোটদা কি আর্গোসকে নিয়ে মাঠে গেছে?"

মা বললেন, "না, আর্গোস বেরোতে চাচ্ছে না। খাটের নীচে বসে আছে।"

আমি ডাকতেই খাটের নীচে থেকে আর্গোস বেরিয়ে এল। ওর সেই কালো-কালো চোখ দুটো আমার এখনও মনে পড়ে। ও বুঝতে পেরেছে আমি অসুস্থ। আমার বিছানার ওপর দুটো পা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ওর নাকের কাছটা চকচকে কালো, সব সময় যেন জলে ভেজা। আমার হাতের কাছে নাকটা এনে শুঁকল। তারপর আবার খাটের নীচে গিয়ে ঢুকল। আমার সমস্ত শরীরে ব্যথা। চোখ দুটো ঢুলে আসছে। জ্বালা-জ্বালা করছে। জানালা দিয়ে শুধু দেখতে পাচ্ছি কিরোরি মল কলেজের মাঠের বিরাট লম্বা, উঁচু কাঠের খুঁটি। রাত্রে যখন বাস্কেট বল খেলা হয়, ওই খুঁটিতে আলো লাগানো হয়। সেই খুঁটির ওপর একটা ছাই রঙের বিরাট চিল বসে আছে। আমি আস্তে-আস্তে চোখ বন্ধ করলাম।

পরের দিন সকালে ডাক্তারবাবু এলেন। অনেকক্ষণ ধরে স্টেথিসকোপ দিয়ে বুক দেখলেন, পিঠ দেখলেন। তারপর ওষুধপত্র লিখলেন। আমার অনেকদিন ধরেই নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয় মধ্যে-মধ্যে। হাঁপানির রোগ। সেই রোগটাই আবার হয়েছে। অনেকদিন এসব ছিল না। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন সাঁতার কাটতে। ভেবেছিলাম সাঁতার কাটা শিখব। আর্গোসকেও শেখাব। ওর যা জলের ভয়।

পরের দিন শরীরটা ভাল লাগল। শুয়ে-শুয়ে দুটো বই শেষ করলাম। মা কিছুক্ষণ সত্যজিৎ রায়ের 'এক ডজন গপ্প' থেকে দুটো গল্প শুনিয়ে গেলেন। আজ আর্গোস খাটের তলা থেকে বেরিয়ে অনেকক্ষণ বাইরে ছিল। আজ ঠিকমতো খেল। গত দু'দিন খেতেই চাইছিল না। বিকেলবেলা ছোটদার সঙ্গে মাঠে বেড়াতে গেল। সন্ধেবেলা দেওয়ালে ছায়া দেখে কিছুক্ষণ লম্ফঝম্প করল। আজ আর্গোস বেশ খোশমেজাজে আছে সারাদিন।

রাত্রিবেলা আবার আমার কষ্ট হতে লাগল। পরের দিনও। বাবাকে খুবই চিন্তিত দেখলাম। অনেকক্ষণ আমার মাথার কাছে বসে রইলেন। চুলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মাথাটা টিপে দিলেন। রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। সঙ্গে-সঙ্গে একটা নরমমতো কিসের ওপর পা পড়ে চমকে উঠেছি। কিঁউ করে আর্গোস উঠে দাঁড়াল। আহা! বেচারারার সেই ভাঙা পায়ের ওপর পা দিয়ে ফেলিনি তো। কিন্তু ও বুঝতে পেরেছে যে আমি ইচ্ছে করে করিনি। আমি কিছু বলার আগেই আর্গোস মা-র আঁচল ধরে টানতে লাগল। মা খুব ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। মা ধড়ফড় করে উঠে পড়লেন, "কী রে জল খাবি?" মা আমাকে জল দিলেন।

আর্গোস আবার খাটের তলায় ঢুকে গেল।

আমার মনে হল আর্গোস সারাদিন সারারাত আমাকে পাহারা দিচ্ছে। আমার সমস্ত শরীরে কেমন একটা শিরশিরে ভাব এল। মনে হল, আর্গোস যেন একটা মানুষ। ও কুকুর নয়। কিংবা ও কুকুর,কিন্তু সব বোঝে, সব জানে। আমি কী ভাবছি, আমার কী দরকার ও সব জানে। এতদিন ধরে ওকে জানতাম দুষ্টু, জানতাম ও বুদ্ধিমান—আজ মনে হল আর্গোস, ঠিক যেমন করে মা-বাবা-ছোটদা আমাকে ভালবাসে, ও তেমনই ভালবাসে। এতদিন সেটা বুঝিনি কেন? অন্ধকারে উঁকি মেরে দেখলাম খাটের নীচে। আর্গোস তাকিয়ে আছে, চোখগুলো জ্বলজ্বল করছে। না, আর্গোস যেন কুকুর নয়, অন্য কিছু। ওর শরীরটা কুকুরের, কিন্তু ও যেন কুকুর নয়।

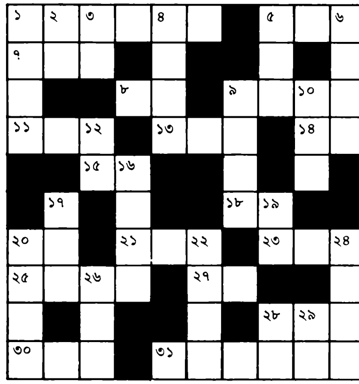

সংকেত : পাশাপাশি : (১) রাবণবধের জন্য রামচন্দ্রের দেবী-আরাধনা। (৫) ভিড়। (৭) মূর্ছা। (৮) অন্ধকার। (৯) শোলা ও রাংতার তৈরি মালা। (১১) যাচাই। (১৩) সৌদি আরবের রাজকীয় রাজধানী। (১৪) অট্টালিকা, বাংলা। (১৫) এই স্থানে, এই সময়ে। (১৮) শত্রু। (২০) পথ, উপায়। (২১) হে বিদেশী ফুল, এ-দেশেও তুমি অতুলিতা। (২৩) কৈলাসের কাছে যে-হ্রদ আছে। (২৫) এটা দেওয়াও খারাপ, খাওয়াও খারাপ। (২৭) শূন্য। (২৮) বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র। (৩০) চোখের পাতা। (৩১) লাল সমুদ্র।

উপর-নীচ : (১) মুনিঋষিরা ক্রুদ্ধ হলে অপরকে দিতেন। (২) দায়, সংকট। (৩) উলটো মিল। (৪) দেববৈদ্য। (৫) মেঘ। (৬) লাঠিতে লাঠিতে লড়াই। (৯) গুলি ছোঁড়া অভ্যাস করতে যে-লক্ষ্যবস্তু প্রয়োজন। (১০) ভীম নাকি এমন ছিলেন। (১২) ধানজাত। (১৩) হল্লা, কোলাহল। (১৭) কলকাতার অনেকটা এলাকা জুড়ে এই বাজনা রয়েছে। (১৯) বিদেশী জন্তুবিশেষ। (২০) উচ্চাঙ্গসংগীতে এটা করতেই হয়। (২২) এমন চিৎকার মানেই 'বাঁচাও, বাঁচাও!' (২৪) 'মীনগণ হীন হয়ে' কোথায় ছিল? (২৬) ইনি গান করেন। (২৮) পৃথিবী। (২৯) বাগান।

গত সংখ্যার সমাধান

কা	ঙা	ল		প	র	স্ব		আ	তা
ষ্ঠ		গ	গু			জ	ন	স্থা	ন
পা	ঠা	ন		ন	বী	ন			সে
দু		সা	ন	ন্দ			স	ঘ	ন
কা	ক			লা	ভ		খা	না	
	পি	লে		ল	গ্ন			দা	হ
অ	লা	বু			দূ	র	গ		স্তা
শ্ব			বি	ত	ত		জ	ঙ্গ	ম
শা	মি	য়া	না			ব্যা	মো		ল
লা	ল		শ	প	থ		তি	ল	ক

রঞ্জন

এক বৎসর

২৬ সংখ্যার জন্য ১৮২ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ১৫৫ টাকা

দুই বৎসর

৫২ সংখ্যার জন্য ৩৬৪ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ৩০০ টাকা

বিদেশের গ্রাহক

বার্ষিক ২৬ সংখ্যার জন্য
৩৯ ডলার অথবা ২১ পাউন্ড

আপনি যদি গ্রাহক হতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা অবিলম্বে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের অনুকূলে চেক অথবা ড্রাফট সহ নীচের ঠিকানায় পাঠান :

সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলিকাতা-৭০০ ০০১

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়

CLARION C-ABAMD-1

আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। আমি সব বোঝাতে পারব না।

পরের দিন ডাক্তারবাবু বললেন, "আজকের দিনটা দেখি। নইলে সকালেই হাসপাতালে পাঠাব।"

আমি বললাম, "আমি হাসপাতালে যাব না।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "কিছু ভয় নেই। দু'দিন থাকবে। মা, বাবা, সবাই যাবেন তোমাকে দেখতে—দু'দিন পরে একেবারে ঠিক হয়ে ফিরে আসবে।"

আমি বললাম, "আর্গোসকে নিয়ে যাব আমি।"

ডাক্তারবাবু হাসলেন, "হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। দু'দিনের ব্যাপার তো। আর্গোস বাড়িতেই থাকবে, তুমি যখন ফিরে আসবে তখন ও তোমাকে রিসিভ করবে। কী বলো?"

আমি চুপ করে বসে রইলাম। বলা যায় না, হাসপাতালে নিয়ে গেলে ও হয়তো নানারকম গোলমাল করবে। ও তো আর চুপ করে বসে থাকবে না। যাকগে, দু'দিন পরেই তো ফিরে আসব।

বিকেলটা আমার খুব খারাপ কাটল না। রাত্রে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, যদিও বেশ জ্বর। বুকে ব্যথা।

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। নিশ্চয়ই অনেক রাত। মা পাশেই শুয়ে আছেন। আমি মা'র গায়ে হাত দিলাম। মা নড়লেন না। বাইরে বারান্দায় একটা অল্প-পাওয়ারের নীল আলো সারারাত জ্বলে আজকাল। সেটা জ্বলছে না। চারদিক অন্ধকার। তবে আকাশে চাঁদ ছিল, একটা সরু আলোর রেখা বারান্দায়। কোথাও কোনও লোক জেগে আছে মনে হয় না। একবার একটা ঠকঠক শব্দ হল। বাংলো রোড দিয়ে রাত্রে মধ্যে-মধ্যে চৌকিদার লাঠির শব্দ করতে-করতে হেঁটে যায়। বোধ হয় তার শব্দ। আস্তে-আস্তে সে শব্দও মিলিয়ে গেল। আমার নাকে মা'র চুলের গন্ধ আসতে লাগল আর কেমন যেন তন্দ্রা এল আমার। চোখে ঘুম, তবু পুরো ঘুম নয়। আমি সব কিছু দেখতে পাচ্ছি।

মনে হল আমার শোবার ঘরের সামনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। আমি অবশ্য তাকে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু বুঝতে পারছি বেশ লম্বা মতন কেউ দাঁড়িয়েছে। দরজার সেই জায়গাটা গাঢ় অন্ধকার। আমার কিন্তু ভয় হল না। কিন্তু কে দাঁড়িয়েছে? বাবা? না, বাবা, হলে এতক্ষণে আলো জ্বলে উঠত, মাকে ডাকতেন। চোর? না, চোর হলে আর্গোস নিশ্চয়ই ভৌ-ভৌ করে উঠত। চোখে পড়ল দরজার চৌকাঠের ধারে আর্গোস। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারের মধ্যেও বোঝা যায় আর্গোস যেন কারও পথ আটকে রেখেছে। লোকটাকে সে ঢুকতে দেবে না। লোকটাও নড়ছে না, আর্গোসও নড়ছে না। অদ্ভুত ব্যাপার।

আমি চুপ করে পড়ে আছি। একবার মনে হল মাকে ডাকি। কিন্তু আমার গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরোল না। ভাবলাম মাকে হাত দিয়ে ঠেলা দিই। কিন্তু আমি হাত নাড়তেই পারলাম না। ভাবলাম উঠে বসি, উঠতেই পারলাম না। অথচ আমি সব দেখতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি। লোকটা ঘরে ঢুকতে চাইছে, কিন্তু কথা বলবে না। আর্গোস তাকে ঢুকতে দেবে না, কিন্তু চেঁচিয়ে আমাদের ডাকবে না। বেশ মজা তো। আর্গোস সরে দাঁড়ায়, বোধ হয় লোকটা সরে দাঁড়িয়েছিল। লোকটা এদিক দিয়ে ঢুকবে ভাবছে, তাই আর্গোসও সরে দাঁড়াচ্ছে।

আমি লোকটাকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তার চেহারাটা বেশ কল্পনা করতে পারছি। খুব বিকট চেহারা তার। খুব বড় চেহারা। বোধ হয় মাথায় জটা আছে সন্ন্যাসীদের মতো। তাকে দেখতে ঠিক যেন ছবিতে আঁকা অন্ধকার। তার মুখ কেমন, চোখ কেমন, নাক কেমন আমি কিছুই বলতে পারব না। সমস্তটাই আমার ধারণা।

লোকটা এল কোথা থেকে? দরজা তো বন্ধ। আমি বেশ অবাক হয়ে গেছি। এমন সময় শুনলাম লোকটা কথা বলল। ফিসফিস করে নয়, স্পষ্ট স্বরে। লোকটা বলল, "আমি ভেতরে যাব, পথ ছাড়।"

আর্গোস কিন্তু পথ ছাড়ল না।

লোকটা আবার বলল, "আমি ওকে নিয়ে যাব বলে এসেছি।"

কাকে নিয়ে যেতে এসেছে? কোথায় নিয়ে যাবে? ছেলেধরা নাকি? কিন্তু ছেলেধরা হলে আর্গোসের সঙ্গে এভাবে কথা বলবে কেন?

আর্গোস কিন্তু ঠিক সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটা বলল, "আর্গোস পথ ছাড়।"

লোকটা তা হলে আর্গোসের নামও জানে। আমাদের চেনা লোক কেউ? কিন্তু কারও এমন গলা তো শুনিনি।

লোকটা বলল, "আমাকে নিয়ে যেতেই হবে।" আর্গোস এবার চৌকাঠের ধারে শুয়ে পড়ল।

লোকটা বলল, "তা হয় না।"

কী হয় না? আর্গোস কি কোনও কথা বলেছে? কোন কথা বলল? আমি সে কথা কেন শুনতে পেলাম না?

লোকটি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "বেশ, তাই হবে। তোমাকেই নিয়ে যাব। আবার আসব।"

কী হবে? কেন আসবে? কেন বলল, তোমাকেই নিয়ে যাব?

আমার যেন শরীরে আবার শান্তি ফিরে এল। দেখলাম দরজার ধারে সেই ঘন জমাট অন্ধকার মিলিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো টলটল করছে। আমার ওষুধের শিশির ওপর, আর কাচের গ্লাসের ওপর চাঁদের আলো চকচক করছে। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, "মা, মা, লোকটা কে?"

মা মাথায় হাত রাখলেন। দেখি, একী, চারদিকে আলো জ্বলছে। মা, বাবা, ছোটদা সবাই পাশে। আমাকে কাকু কোলে করে নিয়ে যাচ্ছেন। ডাক্তারবাবু পাশে-পাশে। আমি নীচে নামছি। সামনে অ্যাম্বুলেন্স। যখন গাড়ি চলতে আরম্ভ করল, তখন আমার কানে একটা আওয়াজ এল। আর্গোসের ডাক। এমন ডাক আমি আগে কোনওদিন শুনিনি। কিন্তু আমি গাড়ির মধ্যে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

॥ চোদ্দ ॥

দু'দিন নয়, বারো দিন পরে আমি হাসপাতাল থেকে ফিরে এলাম। ঘরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গেই লাফিয়ে এল আর্গোস। বাবা বিরক্ত হলেন। বললেন, "আর্গোসকে এখান থেকে নিয়ে যাও।"

আমি বললাম, "না, থাক।"

আমি তখন বেশ দুর্বল। কিন্তু আমার আর অসুখ নেই। ডাক্তারবাবু বলেছেন আমাকে দিল্লির বাইরে নিয়ে যেতে। আমার এক পিসি বলেছেন, গোপালপুরে সমুদ্রের ধারে তাঁদের বাড়ি আছে। সেইখানে আমরা যাব একমাসের জন্য। আমি শুয়ে-শুয়ে রোজ ভাবি এই আমরা গোপালপুরে যাচ্ছি।

আর্গোসকে ডেকে বললাম, "আর্গোস, এবার আমরা সবাই সমুদ্রের ধারে যাব। তুই তো কখনও সমুদ্র দেখিসনি, এইবার দেখবি। কত ঢেউ, কত ঢেউ! আর কী নীল! ভোর বেলায় আমরা সমুদ্রের ধারে বালির ওপরে দৌড়ব।

আর্গোস গম্ভীর হয়ে শোনে। আর আমার হাত চেটে দেয়।

আমি এখন আগের চেয়ে বেশ সুস্থ। শরৎকাল এসে গেছে, বৃষ্টি শেষ হয়েছে। জিনিসপত্র গোছগাছ হচ্ছে। আমরা গোপালপুর যাব।

আর্গোসিও যাবে। মা বললেন, "ওকে না নিলে কোথায় রেখে যাবে ? ও যা দুষ্টু !"

তাই আর্গোসের জন্যও টিকিট কাটা হয়েছে। ট্রেনে কুকুরদের জন্য আলাদা একটা খাঁচা আছে। আমরা মধ্যে-মধ্যে বড়-বড় স্টেশনে নেমে দেখে আসব।

"কী রে আর্গোস, কেমন মজা। দেখিস যেন ট্রেনের মধ্যে কোনও দুষ্টুমি করিসনি।"

গোপালপুর যাবার দু'দিন আগে। রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে আর্গোস এল আমার বিছানার কাছে। আমি ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলাম। তারপর আর্গোস আমার খাটের তলায় চলে গেল। অনেক দিন ও খাটের তলায় ঘুমোয়নি।

রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল ভোর হয়ে আসছে। জানালাটা খোলা ছিল। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। একটা পাখির ডাকও যেন শুনলাম। দেখলাম, আর্গোস চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে। আর তার ঠিক সামনেই সেই অন্ধকারের মতো লোক। আমি উঠতে চাইলাম, কিন্তু কেউ যেন আমার শরীরটা আটকে রেখেছে। তারপর দেখলাম, আর্গোস চৌকাঠ ডিঙিয়ে গেল। আর্গোস চলছে।

তা হলে কি সেই লোকটা ফিরে এসেছে ? ও যে বলেছিল নিয়ে যাবে। ও কি আর্গোসকে নিয়ে যাচ্ছে ?

আমি লাফিয়ে উঠলাম। বিছানা থেকে নামলাম। আমি ভাল হয়ে গেছি। আমার কোনও কষ্ট নেই। আমার শরীরটা মনে হল হালকা, ঝরঝরে। বাইরে ভোরের ঝাপসা আলো। আমি ডাকলাম, "আর্গোস, আর্গোস।"

কিন্তু আর্গোস আমার কথা শুনছে না। সে নীচে নেমে যাচ্ছে।

দরজাটা কে খুলেছে ? বোধ হয় কাকু ভোরবেলা দুধ আনতে বেরিয়েছেন। কোনও খেয়ালই নেই, চোর ঢুকতেও পারে তো।

আমি পেছনে-পেছনে চললাম।

আর্গোস ছুটছে। আমি বললাম, "দাঁড়া, দাঁড়া আর্গোস।"

বাড়ির ঠিক বাইরেই ছোট একটা মাঠ। শরতের শিশিরে ঘাস ঝকঝক করছে। একেবারে শেষে একটা শিউলি গাছ।

হঠাৎ একবার আর্গোস পেছন ফিরে তাকাল। দৌড়ে পালাবার আগে যেমন করে দুষ্টুমির চোখে ও তাকায়। তখনও পুব আকাশে শুকতারা জ্বলছে। আর্গোস দৌড়তে শুরু করল। সারা মাঠটা দৌড়ল। আমিও ওর পেছনে-পেছনে। তারপর শিউলি গাছের পাশে হঠাৎ চুপ করে দাঁড়াল। আমি এতক্ষণ পরে আর্গোসকে ধরলাম।

আর্গোস আমার কোলের ওপর মাথা রেখে চোখ বন্ধ করল।

আমি ডাকলাম, "আর্গোস, আর্গোস।"

আর্গোস সাড়া দিল না।

আমি আস্তে-আস্তে আর্গোসকে শিউলি ফুলে ভরা মাটির ওপর শুইয়ে দিলাম। আমার মনে হল, সেই অন্ধকারে লোকটা যেন এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে। কিন্তু আস্তে-আস্তে ভোর হতে লাগল। কোথাও কোনও অন্ধকার নেই। সবুজ গাছের ওপর ঘুমিয়ে আছে শুধু আমাদের সাদা আর্গোস।

আমার চোখে সারা পৃথিবীটা কালো হয়ে এল। সমস্তটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে সমুদ্রের ঢেউ উঠছে আর নামছে, আর প্রত্যেকটা ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা ছড়িয়ে পড়ছে, সাদা, সাদা, সাদা—আর্গোসের মতো। (সমাপ্ত)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

আকাশে ওড়ার কথা □ আঠারো

১৯১০ : কলকাতার আকাশে প্রথম বিমান প্রদর্শনী

কলকাতায় প্রথম বিমান প্রদর্শনী হয় ২৮ ডিসেম্বর ১৯১০ সালে। দুই ফরাসি বৈমানিক ব্যারন দ্য কেটারস ও মঃ জুলেটিক কলকাতার টালিগঞ্জ ক্লাবের রেসকোর্সে এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। সেদিন বেলা বারোটার আগেই কলকাতা থেকে জনতার মিছিল টালিগঞ্জ ক্লাবের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। সেখানে লোকে লোকারণ্য, ভিড় ও জ্যাম এড়াতে পুলিশকে হিমশিম খেতে হয়। ভিড় অবশ্য মাঠের বাইরেই বেশি ছিল।

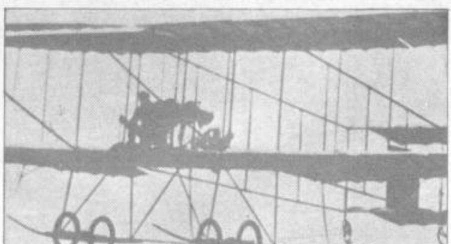

ফারমান-৩ বিমান

মাঠের ভিতরে প্রায় ১০০০ দর্শনার্থী ছিলেন ১০ টাকার আসনে আর তার দ্বিগুণ ছিলেন শস্তার আসনে। মহিলাদের প্রবেশমূল্য ছিল অর্ধেক। সেদিন আবহাওয়া ছিল চমৎকার। প্রথমে ব্যারন দ্য কেটারস তাঁর ফারমান বাইপ্লেন নিয়ে আকাশে ওঠেন ও ১০০ ফুট উচ্চতায় রোমহর্ষক কলাকৌশল দেখান। তিন কয়েকজন যাত্রী নিয়ে অল্প দূরত্বে উড়েও আসেন। যাত্রীদের প্লেনে চড়ার জন্য ১০০ টাকা অগ্রিম দিতে হয়েছিল। এর পর আকাশে ওঠেন মঃ জুলেটিক, তাঁর ছোট ব্লেরিও-১১ মনোপ্লেনে। ২০০০ ফুট উচ্চতায় তাঁর বিমানে ওড়ার নানা কলাকৌশল দেখে সকলে চমৎকৃত হয়ে যান। এই অনুষ্ঠানে বাংলার ছোটলাট বাহাদুর ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কলকাতার সমস্ত সংবাদপত্রে এ-সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়।

অঁরি ফারমান-৩ বিমানের বিশদ বিবরণ :

নির্মাতা— অঁরি ফারমান
লম্বায়— ৩৯ ফুট বা ১২ মিটার
ডানার আয়তন ৩৩ ফুট বা ১০ মিটার
খালি অবস্থায় ওজন— ৯৯০ পাউন্ড বা ৪৫০ কেজি
যাত্রিসংখ্যা — একজন বৈমানিক ও কম জ্বালানি নিলে একজন যাত্রী
গতিবেগ — ঘন্টায় ৩৭ মাইল বা ৬০ কিমি
রেঞ্জ —১১২ মাইল বা ১৮০ কিমি
এঞ্জিন : একটি ৫০ অশ্বশক্তির নোম এঞ্জিন

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কুইজ

নিল ও' ব্রায়েন

তরুণ-তরুণীদের সংগঠন

দুটি নিরপেক্ষ আন্দোলনের ফলে ১৮৭৭ সালে স্থাপিত হয়েছিল ইয়াং ওমেন'স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (Y.W.C.A.)। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল-এর কয়েকজন নার্স জাহাজে ক্রিমিয়া যাওয়ার জন্য লন্ডনে অপেক্ষা করছিলেন। শ্রীমতী কিন্নাইর্ড তাঁদের জন্য লন্ডনে ১৮৫৫ সালে একটি হস্টেল খোলেন। বার্নেট-এ সেই বছরই এমা রবার্টস খোলেন উপাসনার জন্য একটি সমিতি। পরের দিকে মেয়েরা কাজের জন্য আরও বেশি করে শহরে আসতে শুরু করলেন। দেশের নানা জায়গায় তাঁদের জন্য খোলা হল অনেক হস্টেল ও উপাসনা সমিতি। কিন্নাইর্ড ও রবার্টস যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, সেটাই একসঙ্গে মিলেমিশে ১৮৭৭ সালে হল ইয়াং ওমেন'স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। নতুন সংগঠনের কাজের পরিধি বেড়ে গেল। জাহাজে বাইরে যাওয়ার সময় মেয়েদের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রাখা হয় তার জন্য খোলা হল নতুন একটি বিভাগ। খোলা হল একটি কর্মসংস্থা। পরিভ্রমণের খোঁজ-খবর দেওয়ার জন্যও গঠিত হল নতুন দফতর।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিদেশে কর্মরত নার্স ও সেবাকার্যে যুক্ত মহিলাদের জন্য ৪৩টি ক্লাব ও হোটেল খোলা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় Y. W. C. A.-র নানা সেবাকেন্দ্র খোলা হয়েছিল ব্রিটেন থেকে শুরু করে ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায়, এমনকী মধ্য ও দূর-প্রাচ্যে। যুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডে সেবাকার্যে যুক্ত মহিলা, স্থলবাহিনীর সদস্য ও অন্যান্য কর্মীর জন্য ক্লাব, ক্যান্টিন ও ছুটি কাটানোর হস্টেলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ছিল চলমান ক্লাব-ভ্যান।

এখন সারা বিশ্বে Y. W. C. A. নানা ধরনের কাজ করছে। ছাত্র-ছাত্রী এবং নারী ও পুরুষ কর্মীদের জন্য হস্টেল তো আছেই। কর্মরত মহিলারা নিজেদের বাড়ির বাইরে অনেক দূরে কাজ করতে গিয়ে যাতে ঘরোয়া পরিবেশ পান, তার জন্যও আছে নানা ব্যবস্থা। সব বয়সের মানুষের অবসর-বিনোদনের জন্য আছে ক্লাব। তরুণ-তরুণীদের ওপরেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের বয়স ও রুচি অনুযায়ী এইসব ক্লাবে সঙ্গীত, নাটক, খেলাধুলো, হস্তশিল্প, আলোচনা ও এ-ধরনের নানা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি কেন্দ্রই নিজেদের কাজকর্মের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। পরিচালনার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রের আছে স্থানীয় কমিটি। ১৯ থেকে ৩০ বছর বয়সী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত তরুণদের জন্য লন্ডন ও অন্যান্য শহরে সংগঠনের পক্ষ থেকে খোলা হয়েছে কফি ক্লাব। এই ক্লাব বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। ব্রিটেন, আমেরিকা, নরওয়ে ও সুইডেন ১৮৯৪ সালে গঠন করেছিল বিশ্ব ইয়াং ওমেন'স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। জেনিভায় এই সংগঠনের সদর দফতর এখন ৬০টিরও বেশি দেশের সংগঠনগুলিকে সাহায্য করে। নতুন কর্মসূচির পক্ষে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, তহবিল ইত্যাদি সারা বিশ্বের তরুণদের জন্য সংগঠনগুলি এখান থেকে পেতে পারে। সদস্যদের সামাজিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশই এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য।

ফোটো : বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

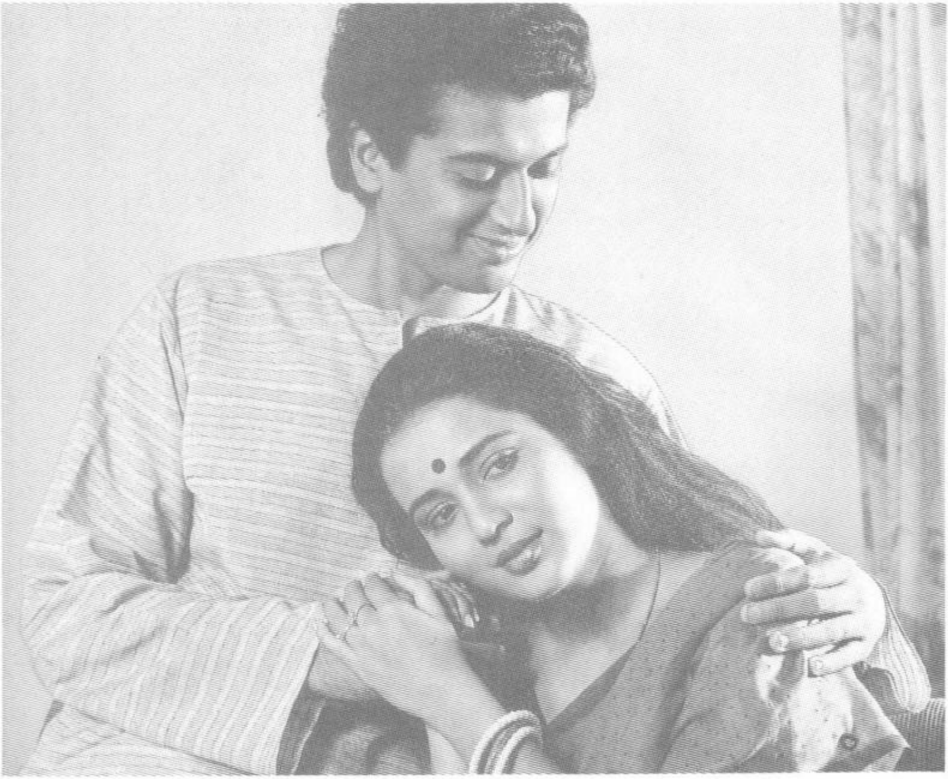

যখন ব্যথা করে, কার কথা মনে পড়ে ?

O&M 1955 BEN

অম্রুতাঞ্জন। প্রায় একশ বছর ধরে, মাথা-ধরা, পিঠে ব্যথা, মচকানো — শরীরের যাবতীয় ব্যথা-বেদনায় অম্রুতাঞ্জন আরাম দিয়ে এসেছে। নির্ভরযোগ্য স্নিগ্ধ অম্রুতাঞ্জন সারা জীবন ধ'রে আপনার বিশ্বস্ত সেবক।

অম্রুতাঞ্জন
পেইন্ বাম

অম্রুতাঞ্জন লিমিটেড

কুইজ

প্রশ্ন

(১) ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার নাম কী ? **অনীককুমার সাঁই**, বর্ধমান।
(২) 'হাফ নেলসন' কী ? **তমাল ঠাকুর**, কলকাতা-৪৬।
(৩) পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী কোনটি ? **জয়দীপ ঘটক**, সিহাড়শোল রাজ উচ্চতর বিদ্যালয়।
(৪) পি টি উষার পুরো নাম কী ? **রাজশেখর চক্রবর্তী**, রানিগঞ্জ।
(৫) সি ভি রামন কত সালে নোবেল পান ? **তড়িৎ হালদার**, কলকাতা-১৪।

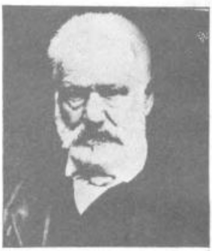

(৬) মুঘল সম্রাট বাবরের আত্মজীবনীর নাম কী ? **অনীককুমার সাঁই**, বর্ধমান।
(৭) রাশিয়ার শেষ জার কে ছিলেন ? **সন্দীপ মিত্র**, সোনারপুর।
(৮) ব্রিটেনের প্রাচীন নাম কী ? **রিন্টু সাঁই**, বর্ধমান।
(৯) তখত-ই-তাউস কী নামে বেশি পরিচিত ? **নীলাঞ্জনা ও অপরূপা মাহাত**, রানি বিনোদমঞ্জরী রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম।

(১০) 'জন্মভূমি' বইটি কার লেখা ? **রানা বসু**, জুলিয়েন ডে স্কুল।
(১১) ভারতের কোন শহরটি দুটি রাজ্যের রাজধানী ? **সিরাজ দত্ত**, ঝাড়গ্রাম ননীবালা বয়েজ হাই স্কুল, ঝাড়গ্রাম।
(১২) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য কে ?

শ্যামল দাস, পুরুলিয়া জেলা স্কুল।
(১৩) কোন যন্ত্র দিয়ে পর্বতের উচ্চতা মাপা হয় ? **ডোডো দাশগুপ্ত**, কলকাতা-১৪।
(১৪) গ্রিক পুরাণে বৃষ্টির দেবতা কে ? **সেখ আবদুর রব**, মেমারি।
(১৫) ইতিহাসে জুনা খাঁ কী নামে বেশি পরিচিত ? **সৌমেন বসু**, মেমারি।
(১৬) 'The Song Of India' কার লেখা ? **সুরজিৎ বটব্যাল**, অমরকানন।
(১৭) রিক্‌সডাগ কোন দেশের পার্লামেন্টের নাম ? **অরূপ দে**, চেতলা।

(১৮) 'যুবনাশ্ব' কার ছদ্মনাম ? **ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়**, কলকাতা-১৫।
(১৯)'হাঞ্চব্যাক অব নটরডাম' কার লেখা ? **রীণা দে**, কলকাতা-২৭।
(২০) 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন ? **শুভব্রত চট্টোপাধ্যায়**, হিন্দু স্কুল।
(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

স্টেফি গ্রাফ

(১) কাম্পুচিয়া।
(২) স্টেফিন মারিয়া গ্রাফ।
(৩) ১৫৯টি দেশ।
(৪) ভারতের ভাগবত চন্দ্রশেখর।
(৫) হরিয়ানা।
(৬) প্লাটিপাস।
(৭) চেতন চৌহান।
(৮) মহাশ্বেতা দেবী।
(৯) জর্জ অরওয়েল।
(১০) ২৬ সেপ্টেম্বর।
(১১) ১৪ অগস্ট।
(১২) প্যারিসে।
(১৩) রোমানিয়া।
(১৪) ২০৬টি।
(১৫) কানাডার ভিক্টোরিয়ায়।
(১৬) টেস্ট অ্যান্ড কাউন্টি ক্রিকেট বোর্ড।
(১৭) মাদ্রিদ।
(১৮) লন্ডনে।
(১৯) তেজেশচন্দ্র সোম।
(২০) এগুলি সবই কানাডার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত নদী।
(২১) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম।

চন্দ্রশেখর

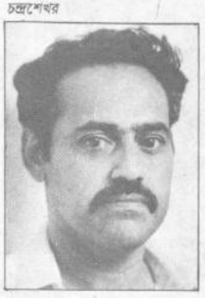

কুইজ

বিষয় : ভারতের সংবিধান

প্রশ্ন

(১) কোন তারিখ থেকে ভারতীয় সংবিধান কার্যকর হয়েছে ?

(২) এই সংবিধান প্রণয়ন করেছে কে ?

(৩) সংবিধান সংশোধন করার ক্ষমতা আছে কার ?

(৪) লোকসভায় কী কী শ্রেণীর মন্ত্রী আছে ?

(৫) সংসদ ভেঙে দেওয়া হলে লোকসভায় বকেয়া বিলগুলির কী হয় ?

(৬) রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হতে গেলে নাগরিকের ন্যূনতম বয়স কত হতে হবে ?

(৭) ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব সংবিধান কার ওপর ন্যস্ত করেছে ?

(৮) প্রয়োজনের সময় একটি রাজ্যের অস্থায়ী রাজ্যপাল হিসেবে সচরাচর কাকে নিয়োগ করা হয় ?

(৯) কী ধরনের বিল রাজ্যসভায় উত্থাপন করা যায় না ?

(১০) বিল ও সংসদের আইনের মধ্যে তফাত কী ?

(১১) রাজ্য আইনসভার অধিবেশনে সদস্যদের সামনে রাজ্যপাল যে ভাষণ পড়ে শোনান, তা কে লিখে দেন ?

(১২) অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের প্রতিনিধিত্বের জন্য সংবিধানে বিশেষ কী ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ?

(১৩) শ্বেতপত্র কী ?

(১৪) সংসদের উভয় সভার অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি কখন ভাষণ দেন ?

(১৫) সংসদ রাষ্ট্রপতির আদেশে স্থগিত রাখা হলে বকেয়া বিলগুলির কী হয় ?

(১৬) কার সভাপতিত্বে রাজ্যসভার কাজকর্ম চলে ?

(১৭) ভারতের উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনে কারা ভোট দেন ?

(১৮) ভারতে সরকারের প্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধানের পার্থক্য কী ?

(১৯) নীচের তিনটি ছবির পরিচয় কী ?

(খ)

(ক)

(গ)

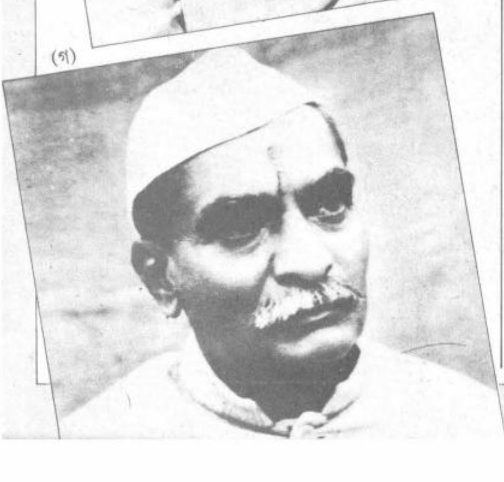

উত্তর : (১) ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০। (২) গণপরিষদ। (৩) শুধু সংসদই সংবিধান সংশোধন করতে পারে। কীভাবে করতে হবে তাও সংবিধানে বলা আছে। (৪) ক্যাবিনেট মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী।
(৫) বিলগুলি বাতিল হয়ে যায়। (৬) ৩৫ বছর। (৭) ভারতের রাষ্ট্রপতির ওপর। (৮) হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি। (৯) অর্থ বিল। (১০) সংসদে আইনের খসড়াটিকে বলা হয় বিল। লোকসভার ও রাজ্যসভার অনুমোদন এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেলে তবেই এই বিল আইনে পরিণত হয়। (১১) রাজ্য মন্ত্রিসভা। (১২) অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের মধ্যে দু'জনকে রাষ্ট্রপতি লোকসভায় মনোনয়ন দিতে পারেন। রাজ্য আইনসভায় রাজ্যপাল একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানকে সদস্য হিসেবে মনোনীত করতে পারেন।
(১৩) কোনও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বা 'ইস্যু' নিয়ে সরকারের রিপোর্ট বা নীতি সংক্রান্ত বিবৃতি। এই শ্বেতপত্র সংসদে পেশ করা হয়, এবং সাধারণত এ নিয়ে বিতর্কও হয়ে থাকে। (১৪) সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম অধিবেশনে এবং প্রতি বছর নতুন অধিবেশন শুরুর সময়। (১৫) বিলগুলি বাতিল হয়ে যায় না, সংসদের অধিবেশন আবার শুরু হলে বিলগুলি নিয়ে করণীয় সব-কিছুই আবার করা যায়। (১৬) পদাধিকার বলে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হচ্ছেন উপরাষ্ট্রপতি। (১৯) (ক) মেকলে—ইনি ভারতের দণ্ডবিধির খসড়া করেছিলেন। (খ) আম্বেদকর—এঁকে বলা হয় 'ভারতীয় সংবিধানের জনক'। (গ) ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

আমাকে ফিরে আসতে দেখে প্রাণের বন্ধু ববি স্মাইল্‌স বেশ চমকে যাবে !
ওঃ ! আমরা পাহাড়ের কাছে আসছি
পায়ের ছাপ এখনও স্পষ্ট... খুবই টাটকা ।
উপরে ওখানে একটা ঘর...ওটাই কি ? গা ঢাকা দেবার পক্ষে আদর্শ জায়গা !
আমাদের কি ওখানে উঠতে হবে নাকি ?
আচ্ছা ! ও এসে গেছে ! এখনও পিছনে লেগে আছে... ঠিক আছে, সুবিধেই হল !
আমরা পাহাড়ে বেশি চড়ি না... ভাল অনুশীলন হবে, বুঝলি কুট্টুস ! ...
জানো টিনটিন, কিছু লোক এতে মজা পায়!
আর এক মিনিট ... ও প্রায় সেখানে পৌঁছে গেছে ...এবার হবে আসল মজা ...
এক ... দুই ... তিন !... ব্যস, কেল্লা ফতে ! এই গল্পটি তুমি আর লিখবে না, টিনটিন !
সর্বনাশ! ও আমাদের শেষ করেছে ! ডিনামাইট দিয়ে পাথরের ধস নামিয়েছে । এবার রক্ষা নেই, কুট্টুস !

আমেরিকায় টিনটিন

আধখানা পাহাড় উড়িয়ে দিতে হল বটে, তবে তাতে কাজ হয়েছে !
আমার স্বর্গত প্রিয় বন্ধু টিনটিন, তোমার আত্মার শান্তির জন্যে !
এবং তোমার আত্মার শান্তির জন্যেও বটে !
কবর থেকে উঠে এসেছে !
কবর থেকেই বটে ! মাথার ওপর ঝুলে থাকা একটা পাথর না বাঁচালে ...
... আমি মরে ভূত হয়ে যেতাম !
তবে না-হওয়ার থেকে দেরিতে হওয়া ভাল !
গুড়ুম
খাসা টিপ, তাই না, মিঃ স্মাইল্‌স ?
বিশ্বাস করুন, ধরা দেওয়া ঢের ভাল । দেখতে পাচ্ছেন আমি শেষ পর্যন্ত কাজ হাসিল করি ।
চালাকির চেষ্টা কোরো না !
তিন দিন পরে, শিকাগোতে ...
হেল্লো ? ... কে ? পুলিশ কমিশনার ? ...হ্যাঁ, আমি !...টিনটিন ? না । কোনও পাত্তা নেই... অনেকদিন গেছে... ঝামেলা ?...হ্যাঁ !... না ... খবর নেই ...
ভেতরে এসো !

ব্যাটম্যান
'জেসি জেম্স' আর 'বিলি দ্য কিড' নাম নিয়ে ডাকাতরা যে-আধুনিক মেলট্রেন লুঠ করছে, রেল কম্পানির শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত ১৮৪৪ সালের একটি ট্রেন নিয়ে ব্যাটম্যান আর রবিন সেটি ধরে ফেলেছে ...
তা হলে বিলি দ্য কিড এখনও ডাকাতের অভিনয় চালাচ্ছে ?
অ্যাঁ ? সেই রবিন ছোকরা !
এক ছোকরাকে আর-এক ছোকরার অভিনন্দন !
দমাস
সেই মুহূর্তে ডাক-বগির দরজা খুলে গেল ...
মেল-ট্রেন লুঠের কায়দাটা খাসা ... ওহ্-ওহ্ !
এ কী ? ? ব্যাটম্যান ! আজ তোমার খেলা শেষ !
হঠাৎ দরজা খুলে হ্যামলেট ট্রেনের ছাদে উঠে গেল
ওতে সুবিধে হবে না ! তোমার জেসি জেম্স্ সাজা আজ শেষ !
তাই বুঝি ? তোমাকে এখানে টেনে এনেছি তার কারণ এখানে তোমার ঘুসি অচল, ফলে আমার কাজ সহজ হবে । তৈরি হও !
ফাঁদে পড়েছি । তবে সময় পেলে উপায় হবে !
তা হলে আমাকে তুমি ধরেছ ...
অনেকে যা পারেনি তুমি তা পারলে । নিশ্চয় তোমার যোগ্যতা তাদের থেকে বেশি ।
তোমার মুখে প্রশস্তি শুনতে মিষ্টি, ব্যাটম্যান । তোমাকে মারতে দুঃখ হচ্ছে ...
বাহ্ ! গপ্পো ! এর জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম !
গপ্পে মেতে নিচু পুলের হুঁশিয়ারি "ঝোলানো দড়ি" হ্যামলেটের নজর এড়িয়ে গেল...
তবে ভাগ্য তোমার...আহ্ ! এ কী ? !
ট্রেন হঠাৎ সুড়ঙ্গে ঢুকতেই ছাদের ওপর শুয়ে-পড়া দুটি লোক অন্ধকারে ডুবে গেল !
তোমার যাত্রা শেষ, বন্ধু ! এবার শ্রীঘর !
দৈনিক বিশ্ব
ব্যাটম্যানের হাতে রেল ডাকাত গ্রেফতার
গোথাম বার্তা
১৯৪৪ সালের ট্রেন উদ্ধারে ১৮৪৪ সালের লোহার ঘোড়ার সাহায্য
এবার লোহার ঘোড়ার অবসর ! বুড়ো ঘোড়া ভেলকি দেখিয়েছে !
লোহার ঘোড়া, তবে নৈকষ্য কুলীন । নিজের জন্যে ও নিশ্চয় গর্বিত !
এবং কতটা তা শুনুন ...
ভোঁওওও
ভোঁওওও

ব্যাটম্যান
তেলও সোনার মতো, খুঁজলে মেলে। তবে অনেক ধৈর্য নিয়ে মাটির নীচে দীর্ঘদিন খুঁজতে হয়...প্রথমে মাটির গভীরে ড্রিলিং, পরে কখনও মেলে সেই কৃষ্ণ স্তর, যা 'তরল সোনা'-র অস্তিত্ব জানিয়ে দেয়...
তেল পেয়েছি, মিস পার্কার ! 'বিগ টিম'-এর বাধা সত্ত্বেও !
জানতাম জয় আসবে ! আজ যদি বাবা বেঁচে থাকতেন !
উত্তেজক মুহূর্তটির সাক্ষী ব্রুস ওয়েন আর ডিক গ্রেসন। ওরা এখানে বেড়াতে এসেছে।
নাইট্রোগ্লিসারিন কার্তুজ, ডিক। কাজটাকে ওরা বলে "কুয়ো ভাঙা"।
অন্য কোনও ঘটনা না ঘটলেও এটাই যথেষ্ট উত্তেজক !
এবং বিস্ফোরণের শব্দ মেলাতেই মাটির গভীর থেকে প্রচণ্ডতম বিস্ময় দেখা দিল !
জলদি ! মুখ বন্ধ করো !
এটা ফোয়ারা !
এটা রুথ পার্কারের হাজারো ঝামেলা পোয়াবার পুরস্কার !
হঠাৎ ডেরিক্‌স্-এর বনে একটি রাইফেল গর্জে উঠল
জো ঠিক জানো এক গুলিতেই কাজ হবে ?
আমার আগুনে কার্তুজ আমি ভালই চিনি !
জ্বলন্ত কিছু উড়ে এসে অশোধিত তেলের মধ্যে পড়ল...
ডিক, হুঁশিয়ার !
আগে যন্ত্রপাতি নষ্ট করেছে, পরে মজুরদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছে... আর এখন এই ! 'বিগ টিম' আমাকেও বাবার মতো হারিয়ে দিল !
আগুন লাগবার আগেই ওদিকে একটা গুলির শব্দ শুনেছি !
ব্যাটম্যানের সাহায্য চেয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম ! কিন্তু জবাবই মেলেনি !
অন্ধকারে দ্রুত সাজবদল চলছে...
ওর ধারণা ভুল ! ব্যাটম্যান সশরীরে জবাব দিচ্ছে ! সঙ্গে রবিনও আছে !
তাড়াতাড়ি গেলে গুণ্ডাদের ধরতে পারব !
অগ্নিবিধ্বস্ত রাতের বুকে দুটি ছায়া ছুটছে !
ব্যাটম্যান ! ও যে এখানে সে-কথা কেউ বলেনি !
ওকে আমি দেখছি, রবিন ! ওদিকটা দ্যাখো ! কাউকে দেখলে চেঁচাবে !
ও আর এখানে নেই, পিটি ! এখন ও অন্য জগতে !
আশা করি বরাবরের জন্যে !
তাই হবে, যদি আমি ছুটতে শুরু করলে তেলের গাদ জ্বালিয়ে ছুঁড়ে দাও !
মানুষকে পোড়ানো পছন্দ করি না... তবে কুড়ি বছর ঘানি টানার চেয়ে সেটা ভাল !

এই শীত

সুনীল বসু

এই শীতে আমি কিনব একটা লাল বালাপোশ
যদি পাই কিনি পাখি, গিনিপিগ, সাদা খরগোশ ।
শুনে যা রে ভুতো আমার মনের ছোট ফিরিস্তি—
মনে পড়ছে না কে ছিলেন যেন সেলিম চিস্তি !
ইতিহাস আর সুগোল ভূগোল ভাল লাগে খুব
ডুব দিয়ে পড়া, জানিস কি তুই নদী দানিয়ুব—
ঢেকে যায় শীতে নরম তুষারে, কোথা গ্লেসিয়ার—
কার নাম বল্ কেসিয়াস ক্লে, বা গোটা এশিয়ার,
মধ্যে কোথায় সবচেয়ে বেশি শীতের প্রকোপ ?
যদি কলকাতা শীতকালে ঢাকে তুষার-বরফ !
সোনাদিদি থাকে বম্বের কাছে সুদূর নাসিকে
লিখে দিলে হয় একটা চিঠিতে কথাটা মাসিকে ;
আসছি আমরা তোমার ওখানে এ-বছর শীতে
যেহেতু অফিস-টুরে যাচ্ছেন বাবা মানালিতে ।
শীতে হয় জানি এ-শহরে খুব গানের আসর
সবজির বনে অফুরান ফলে টমাটো গাজর ।
সিঁদুরের লাল চুরি করে হাসে হাজার গোলাপ
সারা রাত বকে দিগন্ত শুধু তারার প্রলাপ ।
সবুজ পাতার ফাঁকে দ্যাখ কত ফলেছে লঙ্কা
চোখ ভরে দ্যাখ বুলি ও যমুনা, তুলি ও কঙ্কা ।
দারুণ ইচ্ছে একমনে শিখি আরবি ও ফার্সি
রামমোহন কি জানতেন ভাষা কী মানে শার্সি ।
শীতে খাও শুধু বেগনি-ফুলুরি আর ফুলকপি
খাওয়ার মজায় পালাবে মনের যত বেয়াদপি ।
গ্রীষ্মেতে যেই রোদ্দুর ছিল খ্যাপা গিলোটিন
সেই রোদ্দুর সবজিতে দেয় শুধু ভিটামিন ।
আছে যত ঋতু সব করে ভিতু শুধু এ শৈত্য
নয় ভাই আর স্বার্থপর সে খ্যাপাটে দৈত্য !
কত চাই সোনা মুঠোমুঠো সোনা দেবে রোদ্দুর—
আমার হৃদয় শীতকালে হয় খুশি সমুদ্দুর ॥

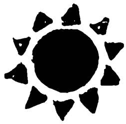

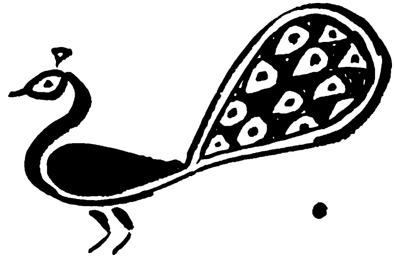

পড়া এবং খেলার ফাঁকে

শিবময় দাশগুপ্ত

সময় এখন ঝুরঝুরিয়ে হলুদ পাতা ঝরিয়ে দেয়
সময় এখন ফুল ফোটানোর দিন থেকে সব সরিয়ে নেয়
সময় জানে পড়ার টেবিল লেখার কলম ঘুমোচ্ছে
সময় জানে শীতের দিনে কোথায় এখন কী হচ্ছে ।

যখন শহর মফস্বলে সন্ধে নামে চট করে
যখন শহর নীল কুয়াশায় জড়িয়ে থাকে ঠিক ভোরে
তখন আমি যাই বেড়াতে পার্ক সার্কাস ময়দানে
তখন তুমি চাও বেড়াতে পাখিরালয় মন টানে ।

পাখিরালয় হয়তো চেনো চিড়িয়াখানা খুব জানা
পার্ক সার্কাস ময়দানে কোন্ সার্কাসদল দেয় হানা ।

একটি ময়ূর পেখম তোলে কিন্তু পায়ে নূপুর নেই
একটি হরিণ শিঙ বাঁকিয়ে জড়ায় নিঝুম দুপুরকেই
লক্ষ্যবিহীন শঙ্খচূড়ের চতুর ফণা বিষ কোথায়
লক্ষ পাখির উড়াল ডানা চায় ঠিকানা কলকাতায় ।

তর্জনী যেই তুললে তুমি ব্যস্ত বাঘের গর্জনে
আলিপুরের ট্রামের শব্দ ডোবে হাতির বৃংহণে ।

দুজন জোকার মুচকি হেসে বলল এসে 'স্বাগতম'
দুজন জোকার ডিগবাজি খায় আসর জমে সরগরম
ওই বালিকা পরির বেশে শূন্যে ওড়ে কোন ছলে
ওই যে বালক এই আগুনের ঘূর্ণি পেরোয় কৌশলে ।

সিংহ যখন কুংফু নাচে দু'জন জোকার গান ধরে
একটি বাঁদর ঘণ্টা বাজায় সবাই খেলা শেষ করে ।

আমরা জানি পড়া এবং খেলার ফাঁকে বছর শেষ
সবুজ শাখায় ফুল ফুটেছে হলুদ শাখায় ছদ্মবেশ ।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

তোমাদের জন্য সাম্প্রতিক আনন্দ-সম্ভার

সিদ্ধার্থ ঘোষের

দুটি জমাটি গোয়েন্দাকাহিনী

ভেরেশাগিনের ছবি

দাম ১০·০০

কলকাতার বিখ্যাত মিউজিয়ম জোব চার্নক মেমোরিয়াল হলের কড়া পাহারা এড়িয়ে চুরি হয়ে গেল উনিশ শতকের রুশ শিল্পী ভেরেশাগিনের আঁকা এক দুর্লভ পেন্টিং—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের অমূল্য এক উপকরণ। সিপাহী অভ্যুত্থানের পর কামানের মুখে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়-করানো ও শিকল-দিয়ে-বাঁধা বিদ্রোহী ভারতীয়দের তোপ দেগে উড়িয়ে দেওয়ার ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য এঁকেছিলেন ভেরেশাগিন। সেই ছবিটিই উধাও। এদিকে, কয়েকদিনের মধ্যেই বিশিষ্ট রুশ দর্শকেরা আসবেন মিউজিয়ম দেখতে। তাঁদের এই সফরের সঙ্গে কি কোনও রহস্যময় কোনও সম্পর্ক রয়েছে রহস্যময় ছবি-চুরির ?

মিউজিয়মের সেক্রেটারি কিউরেটর সমেত কোনও কর্মীই সন্দেহের বইরে নন। কে পাচার করল ছবিটি ? কীভাবে ?

এই জটিল রহস্যের পাক খুললেন শেষ পর্যন্ত হলডেন সায়েন্স ক্লাবের সেনাপতি মিহির ঘটক আর তাঁর দুই শাগরেদ।

এই রোমাঞ্চকর কাহিনীর সঙ্গেই মিহির ঘটকের আরেকটি বুদ্ধিদীপ্ত গোয়েন্দাকীর্তি, 'একটি জলবৎ রহস্য'। প্রচ্ছদ : সুব্রত চৌধুরী।

বাণী বসুর

দুটি কল্পবিজ্ঞান-উপন্যাস একসঙ্গে

অপারেশন অরিন্দম

দাম ৮·০০

দুটি অসাধারণ কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস—'অপারেশন অরিন্দম' ও 'দ্বিতীয় পৃথিবী'—নিয়ে এই গ্রন্থ। 'অপারেশন অরিন্দম'-এর কাহিনী গড়ে উঠেছে মুসৌরির পটভূমিকায়। সেখানকার গ্রিন হিল কনজারভেটরির ক্লাস টেন-এর ছাত্র অরিন্দম চোপরা হঠাৎ নিরুদ্দেশ হল। প্রায় একই সময়ে হারিয়ে গেল ছুটি-কাটাতে-আসা এক দম্পতির দু-বছরের ফুটফুটে একটি ছেলে। এই দুই রহস্যজনক অন্তর্ধানকে কেন্দ্র করেই এই উপন্যাস। একদিকে এক কুখ্যাত দুষ্টচক্রের অপরাধের উন্মোচন, অন্যদিকে মানুষের চিন্তা-তরঙ্গকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে ধরার আবিষ্কারের কল্পকথা নিপুণভাবে মিশেছে এই কাহিনীতে। এই পৃথিবীর নানা বয়সের কিছু দুঃখী মানুষ এবং গ্রহান্তরের বাসিন্দা কয়েকজন মহানুভব বিজ্ঞানীকে নিয়ে এক মধুর, মর্মস্পর্শী কাহিনী 'দ্বিতীয় পৃথিবী'। কল্পবিজ্ঞানের রোমাঞ্চের সঙ্গে এ-কাহিনীতে সূক্ষ্মভাবে মিশেছে দেশপ্রেমের প্রেরণা, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে তার সীমাবদ্ধতাকেও। ছোটরা উদ্বুদ্ধ হবে এ-বই পড়ে, বড়রা খুঁজে পাবেন চিন্তাকে উদ্দীপ্ত করার উপাদান। প্রচ্ছদ : বিমল দাস।

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ফোন : ৩১-৪৩৫২

আরও 'আনন্দ'-উপহার

বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, ধাঁধা, ম্যাজিক

পার্থসারথি চক্রবর্তীর

ছোটদের বিজ্ঞানকোষ ৫৫·০০
ছোটদের বিজ্ঞানকোষ (২য়) ৭৫·০০
ছোটদের বিজ্ঞানকোষ তৃতীয় খণ্ড ১০০·০০

পদার্থ বিজ্ঞানের খোশখবর ৮·০০
পলিমার রসায়ন ৬·০০
মজার ইলেকট্রনিকস্ ৮·০০
রসায়নের ভেল্‌কি ৫·০০
চিকিৎসা বিজ্ঞানের আজব কথা ৮·০০

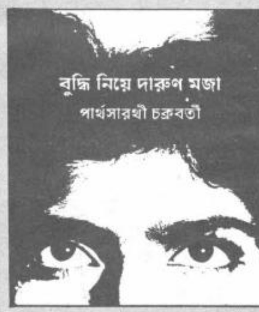

বুদ্ধি নিয়ে দারুণ মজা ৬·০০
মজার এক্সপেরিমেন্ট ৬·০০
তত সহজ ছিল না ৬·০০
মজার কুইজ ও কুইজ নিয়ে দারুণ মজা ১২·০০
কেমিক্যাল ম্যাজিক ৭·০০
ম্যাজিকের মত মজা ৬·০০

মেলচেস্টার রোভার্স প্রথম বিভাগে ফিরে এসেছে ! কিন্তু তাদের নতুন মরসুম মাটি হচ্ছে জখমের সমস্যায় ! তিনজন সেরা খেলোয়াড় ছাড়াই রয় হোভার্টনের সঙ্গে খেলতে বাধ্য হয়েছে !
হোভার্টনেরর সবাই রক্ষণভাগে জড় হলেও রয় তাদের সব রকম বিপদে ফেলছে !
WILLIAMS & CO
গোলকিপারের কাছে ঠেলে দাও...
রোভার্সের রয়
হোভার্টনের রক্ষণভাগের এক খেলোয়াড় মরিয়া হয়ে এগিয়ে এলে...
ওহ্, না !
কেনি লোগান শুনেছে ! যদি ও আগে বলের কাছে পৌঁছতে পারে ...
ওহ্ ! সামান্য দেরি হয়ে গেছে !
চেষ্টা করে যাও, কেনি
কিছুই ঠিকমতো হবে না ! ওর স্বাভাবিক দক্ষতা অক্ষুণ্ণ থাকলে বলটার নাগাল সহজেই পেত ...
যেন তার গোল করা উচিত এ-বিষয়ে সচেতন হয়ে লোগান গতি বাড়িয়ে দিল...
খাসা ট্যাকল, কেনি ! এবার বলটা কাজে লাগাও !
তোমার বাঁ দিকে ভিক্ গাথরি ফাঁকায় দাঁড়িয়ে ...
কিন্তু...
উফ্ !
সর্বনাশ ! ওদের ছ' নম্বরের কাছে বলটা ঠেলেছে !
হোভার্টনের মিডফিল্ডার প্রাণপণে শট নিল এবং...
গোলে ঢুকছে ! দারুণ গোল !
কোনও গোলির সাধ্য নেই ওই বলের কাছে যায় !

বিরতির সময়ে…
সমর্থকরা চাইছিল গোলের বন্যা দিয়ে রোভার্স প্রথম বিভাগে প্রত্যাবর্তনের উৎসব করুক ! কিন্তু শক্তিশালী রোভার্স এমন একটি দলের কাছে হারছে যারা সারাক্ষণ আত্মরক্ষায় ব্যস্ত !
এদিকে…
কেনি, তুমি অজস্র সুযোগ পেয়েও তা কাজে লাগাতে পারোনি । তোমার কোনও অসুবিধা থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে !
আ-আ !
না, রয় ! তোমার দুশ্চিন্তার কারণ হবার মতো কিছু নয় !
ভুল কথা ! তুমি দক্ষতা হারালে সেটা গোটা দলেরই দুশ্চিন্তার কারণ!
এবং রোভার্স যখন দ্বিতীয়ার্ধে খেলতে নামল…
অ্যাঁ ? রয় কেনি লোগানকে বসিয়ে সেখানে ট্রেভর ক্যাসিডিকে নামিয়েছে !
কিন্তু, কেন ? লোগান খেটে খেলছিল !
হ্যাঁ ! যে কয়েকজন গোল করতে পারে মনে হচ্ছিল, ও তাদের একজন…
দ্বিতীয় গোলের জন্য হোভার্টন চেপে ধরেছে…
ওহ্হহ ! কী ট্যাকল !
আআআহ !
গাথ্রির খেলা দেখে রোভার্সের খেলার মান সম্পর্কে ওর ধারণা বোঝা যাচ্ছে…
…এবং রেফারি ফ্রি কিকের নির্দেশ দিয়েছে… পেনাল্টি সীমার বাইরে !
কীইইই ?
ট্যাকল্‌টা জোরালো হলেও বিধিসম্মত…আর রোভার্সের 'সুপারব্র্যাট' তা জানত !
ও নিশ্চয় ঠাট্টা করছে ! ওই রেফারিরা কবে আমার সুনামের কথা ভুলবে ?
ভিক, শান্ত হয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াও !
আমরা দেয়াল সাজাবার চেষ্টা করছি…
যখন "শট" নেওয়া হল তখন রোভার্সের "দেওয়াল" সর্বত্র ছড়িয়ে !
সামান্য একটু ফাঁক… কিন্তু হোভার্টন সেটা আবিষ্কার করেছে !
ওয়াল্টার !
কিন্তু রোভার্সের 'তরুণ' গোলকিপার সম্পূর্ণভাবে আড়ালে পড়ে গিয়েছিল…
এইরকম খেললে আগামী বছর আবার আমরা রোভার্সকে দ্বিতীয় বিভাগে খেলতে দেখব !
হোভার্টন দুই শূন্য গোলে এগিয়ে ! যাচ্ছেতাই কাণ্ড !
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ক্রিকেট নিয়ে সারা পৃথিবীতে তো হইচই কম হয় না। ক্রিকেটাররা যেমন বিখ্যাত, তেমনই যাঁরা ক্রিকেট খেলার দুর্লভ সব ছবি তোলেন, ক্রিকেটের ধারাবিবরণী দেন, ক্রিকেট নিয়ে লেখেন অপূর্ব সব লেখা— তাঁরাও কম বিখ্যাত নন। এবার থাকল সেরকম কয়েকজন বিখ্যাত মানুষের ছবি। এখন বলতে হবে কোন ছবিটি কার?

গ..

ঙ..

ক..

ঘ..

খ..

চ..

গত সংখ্যায় ছিল কয়েকজন বিজ্ঞানীর ছবি। (ক) অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। (খ) সার হামফ্রে ডেভি। (গ) এডোয়ার্ড জেনার। (ঘ) উইলিয়ম হার্শেল। (ঙ) লুই পাস্তুর। (চ) উইলহেম কনরাড রন্টজেন। (ছ) স্যামুয়েল কোল্ট।

ধাঁধা

ছোটকার হাতে ধাঁধার খাতা, আমার হাতে কাগজ-পেনসিল। পাতা ওলটাতে-ওলটাতে একটা জায়গায় চোখ আটকে গেছে ছোট্‌কার, ভ্রূ দুটো কুঁচকে রয়েছে। বুঝতেই পারছি, ছোট্‌কা কিছু একটা ভেবে যাচ্ছে। চোখ ধাঁধার খাতায়, কিন্তু মন অন্যত্র। দুজনেই নীরব।

সেই নীরবতা ভেঙে দিল ছোট্‌কারই গলায় গুনগুন করে ওঠা একটি গানের কলি। ঘোর শীতে বর্ষার একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের কলি—খেয়া পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে। আর পরমুহূর্তে ছোট্‌কা বলে উঠল, “খেয়া পারাপারের ধাঁধাগুলো যেমন পুরনো, তেমনই মজার। এ-থেকেই একটা সহজ ধাঁধা দিই তোকে। পরের বার দেব তুলনায় শক্ত একটা ধাঁধা। এগুলো জেনে রাখা দরকার। সুতরাং লিখে নে।”

ছোট্‌কা বলে গেল, আমি লিখে নিলাম। লিখতে-লিখতেই অনুভব করছিলাম, সত্যি এ-জাতীয় ধাঁধা দেওয়াই হয় না।

প্রথম ধাঁধা ॥ একজন মোটাসোটা চেহারার ভদ্রলোক নদীপারে এসেছেন দুই ছেলেকে নিয়ে। নৌকো চড়ে ওপারে যাবেন। এসব নৌকোয় কোনও মাঝি থাকে না। নিজেরাই চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়। ভদ্রলোক নৌকো চালাতে পটু। দুই ছেলেও নৌকো বাইতে ওস্তাদ। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়।

নৌকোটাতে খুব বেশি হলে ৮০ কিলো ওজন পর্যন্ত ধরে। ভদ্রলোকের নিজের ওজনই টায়টায় ৮০ কেজি। দুই ছেলের প্রত্যেকের ওজন ৪০ কেজি করে। সুতরাং একবারেই যে তিনজনে নৌকোয় উঠে ওপারে পৌঁছে যাবে, তার উপায় নেই। বেশ কয়েকবার ধরে পারাপার করতে হবে।

বেশ তাই হোক। কীভাবে এই নৌকোটায় চড়ে শেষ পর্যন্ত সবাই ওপারে যাবে, সেটাই হিসেব করে বলো।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ০—এই দশটা সংখ্যাকেই একবার করে ব্যবহার করে কীভাবে ‘এক’ (১) উত্তরে পৌঁছনো যাবে, লিখে দেখাতে পারো? ভগ্নাংশ চলবে।

তৃতীয় ধাঁধা ॥ কোন্‌টি বেমানান?

চেয়ার, টেবিল, সোফা, আরামকেদারা, বেঞ্চি, টুল।

গতবারের উত্তর ॥ (১) ৩৫ টাকা করে চাঁদা। তাই গৌতমের দেওয়া ৩৫ টাকা থেকে অশোক পাবে ২৫ (৬০-৩৫) টাকা, অলোক ১০ টাকা (৪৫ – ৩৫)। (২) মানচিত্রে। (৩) Rhythm.

সত্যসন্ধ

কত কথা

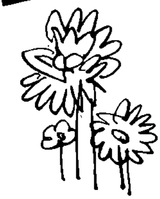

এক শব্দের অক্ষর উলটে-পালটে অন্য শব্দ তৈরি করার মজাটা তোমরা মাঝে-মাঝেই পাচ্ছ। এবারেও সেরকম তিনটি শব্দ দেওয়া হল। এগুলোর অক্ষর উলটোলে-পালটালে কী-কী শব্দ হবে? (ক) অলকা। (খ) পলক। (গ) দমক।

২। চারটে শব্দ দেওয়া হল। এদের আগে যে শূন্যস্থান আছে সেখানে একই শব্দ বারবার বসিয়ে দ্যাখো তো কী দাঁড়ায়।

——ভোজন

——মানব

——রঞ্জন

——কথন

৩। ‘দানবরাজ’ শব্দটির মধ্যে পর-পর মোট ক’টি শব্দ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে?

উত্তর : ১। (ক) অকাল। (খ) কলপ। (গ) কদম। ২। অতিভোজন, অতিমানব, অতিরঞ্জন, অতিকথন। ৩। দান, দানব, নব, বরা, রাজ—মোট পাঁচটি শব্দ।

কথক

মজার খেলা

এবারের মজার খেলার জন্য চাই ২৪টি পোড়া দেশলাইকাঠি অথবা সমসংখ্যক টুথপিক। এর মধ্যে ১৬টি কাঠি দিয়ে তুমি নিজে তৈরি করবে নীচের ছবির মতো একটা ছবি, আর বাকি ৮টি কাঠি আপাতত আলাদা করে সরিয়ে রাখবে। ছবি তৈরির পর বন্ধুর হাতে দেবে সেই কাঠি আটটিকে। বন্ধুকে বলো, এই ছবিটাকে চারটে সমান ভাগে সে ভাগ করে ফেলুক। ভাগ করার জন্য তাকে ব্যবহার করতে হবে আটটি কাঠি।

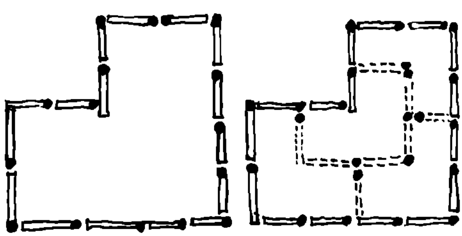

বন্ধু তো করবেই। তার আগে নিজেদের তো সমাধান করে ফেলতে হবে, যাতে-না অপ্রস্তুত হতে হয়। বন্ধু যদি হার স্বীকার করে বলে, তুমি করে দেখাও, তখন?

সেইজন্যই জেনে রাখা দরকার সমাধানটা। নিজেই যদি পারো তবে তো শাবাশ। না পারলে দেখে নাও কীভাবে বসছে আটটি কাঠি আর কীভাবে সমান চার ভাগে ভাগ হচ্ছে ছবিটা—

মজারু

ধাঁধানো ছবি

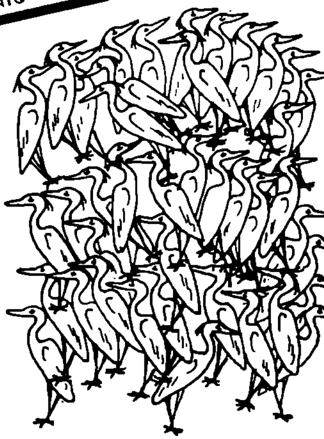

ছবিতে দ্যাখো একসঙ্গে অনেক বক বসে আছে। এত বক একসঙ্গে তোমরা চিড়িয়াখানায়, জলাশয়ে অথবা নদীর ধারে দেখেছ নিশ্চয়ই।

এখন চটপট গুনে বলো তো মোট ক'টি বক আছে ছবিতে ?
উত্তর : একচল্লিশটি বক।

চিত্রক

মজার খবর

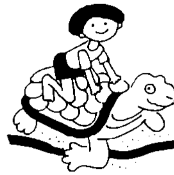

দক্ষিণ ব্রাজিলের এক চাষি তার খেতে একবার একটা বিশাল শশা ফলিয়েছিলেন। শশাটার ওজন ছিল ছাব্বিশ কিলোগ্রাম। সেখান থেকে আরও একজন চাষি পনেরো কিলোগ্রামের একটা আলু ফলিয়ে বিশ্বরেকর্ড করেন।

সেসেল্স দ্বীপের বাচ্চাদের সবচেয়ে প্রিয় খেলা হল কচ্ছপের দৌড়। তোমরা খরগোশ আর কচ্ছপের গল্প পড়েছ। এ আর গল্প নয়, বাচ্চারা রীতিমত কচ্ছপের পিঠে উঠে প্রতিযোগিতায় নামে। তবে এই দৌড় দেখতে গেলে হাতে অনেক সময় থাকা চাই, কেননা এইসব কচ্ছপ ঘণ্টায় পাঁচ মিটার দৌড়য়।

সুরিন উগ্রিন নামে রুমানিয়ার এক চিকিৎসক একটা কাককে সাত বছর ধরে একনাগাড়ে চেষ্টা করে কথা বলতে শিখিয়েছেন। বর্তমানে ওই কাক পঞ্চাশটারও বেশি শব্দ শিখে ফেলেছে।

হরকরা

হাসিখুশি

মা বললেন, "খবরদার রাজু, তোমার বাবা অসুস্থ, ঘুমোচ্ছেন, পটকা ফাটিয়ে বিরক্ত কোরো না।"
রাজু অভয় দিয়ে বলল, "আমি খুব আস্তে ফাটাব মা, বাবা টেরও পাবেন না।"

প্রতিবেশী : বুবু, তোমার ছোট্ট ভাই-এর নামটা বলো তো ?
বুবু : আমি ঠিক জানি না। আসলে ও যে ভাষায় কথা বলে তা আমরা বুঝি না কিনা।

মা : বাবু, তুমি যদি আর একটা মিষ্টিও খাও, তা হলে এক্ষুনি কিন্তু তোমার পেট ফেটে যাবে।
বাবু : মা, তা হলে তুমি আমাকে আর-একটা মিষ্টি দিয়ে শিগগিরি এখান থেকে সরে যাও।

রুমা : মা জানো, আমি একটা দোতলা বাড়ির সমান উঁচু হাতি দেখেছি।
মা : তোমাকে না আমি পঁয়ত্রিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার ষোলোশো সতেরো বার বারণ করেছি, যে, কোনও জিনিস অযথা বাড়িয়ে বলবে না।

আঁকিবুকি

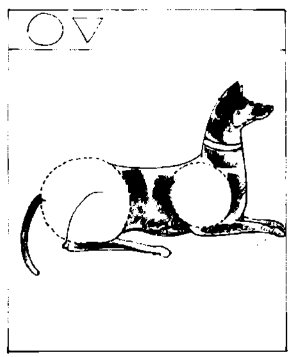

মিলিয়ে দ্যাখো

গত সংখ্যায় বৃত্ত এবং ত্রিভুজ দিয়ে জীবজন্তু আঁকার সূত্র দিয়েছিলাম। তোমরা নিশ্চয়ই ভেবেছিলে, কী ফুটে উঠবে আঁকার পাতায়। এবারের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দ্যাখো তো তোমাদের কল্পনা মিল খুঁজে পেল কি না।

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

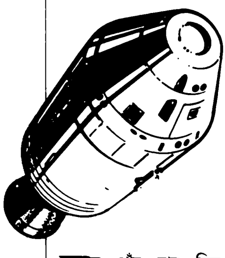

মহাকাশ অভিযানের আশ্চর্য খেলা

কাউন্ট ডাউন

সিদ্ধার্থ ঘোষ

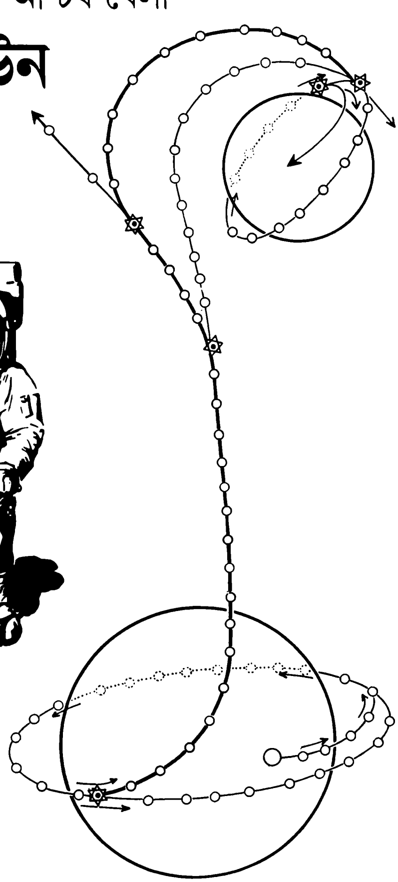

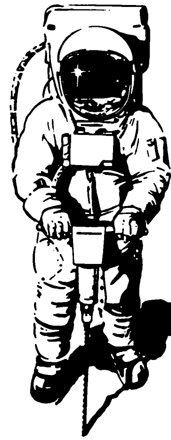

ছয়, পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক ! এক পড়লে তবে তোমার মহাকাশযান এসে বসবে 'START' লেখা ঘরে, পরের চাল থেকে শুরু হবে মহাকাশ-যাত্রা।

দুই, তিন বা চারজনে মিলে মহাকাশের এই দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে। লক্ষ্য, কে আগে চাঁদে অবতরণ করবে। খেলার উপকরণ, প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জন্য আলাদা রঙের এক-একটি ঘুঁটি, একটি লুডো খেলার ছক্কা আর খেলোয়াড় পিছু দুটি করে রকেট।

START লেখা ঘরে বসার পর সকলে পালা করে ছক্কা চালবে। ছক্কার দান অনুযায়ী নভোযান (ঘুঁটি) নির্দিষ্ট পথ ধরে ঘর গুনে-গুনে এগিয়ে যাবে।

পৃথিবীকে পুরো এক পাক খাওয়ার পরে তবে পৃথিবীর কক্ষপথ ছেড়ে চাঁদের দিকে পাড়ি দেওয়া সম্ভব। শুধু তাই নয়, চাঁদের পথ ধরার জন্য ঘুঁটিকে একটি নির্দিষ্ট ঘরে এসে বসতে হবে। তারা চিহ্নওলা ঘরটিতে। তবেই পরবর্তী চালের দান অনুযায়ী রওনা হওয়া যাবে চাঁদের দিকে। অবশ্য এই তারা চিহ্নওলা ঘরের ঠিক আগের ঘর দুটোর মধ্যে যে-কোনও একটায় এসে বসতে পারলেও কক্ষপথ পরিবর্তন সম্ভব। এই ঘর দুটোর পাশে 'ROCKET' লেখা আছে। তবে সে-ক্ষেত্রে অভিযাত্রীকে একটি রকেট ছুঁড়তে হবে। মনে রাখা দরকার, প্রত্যেক অভিযাত্রীর মাত্র দুটি করে রকেট সম্বল। চাঁদে পৌঁছবার আগে আরও রকেট ছোঁড়া দরকার হতে পারে। কাজেই বিবেচনা করে রকেট ছোঁড়া উচিত। যাই হোক, চাঁদের দিকের রাস্তা ধরতে না পারা অবধি নভোযান পৃথিবীর কক্ষেই বারবার ঘুরতে থাকবে।

পৃথিবী ছাড়িয়ে চাঁদের দিকে এগোবার রাস্তাটি এক জায়গায় দু' ভাগ হয়ে গেছে। ডানদিকের পথটি সোজা পথ। কিন্তু এই সোজা পথ ধরতে গেলেও, আগের মতো, হয় ওই তারাওলা ঘরে এসে বসতে হবে, নয়তো, তার আগের দুই ঘরের মধ্যে একটায় বসার পর রকেট ছোঁড়া। নভোযান বাঁ দিকের রাস্তায় চলে গেলে বিপদের আশঙ্কা। এই বাঁ দিকের রাস্তার লাল ঘরটায় এসে বসতে না পারলে নভোযান কক্ষচ্যুত হয়ে মহাকাশে হারিয়ে যাবে। তবে তারাওলা ঘরে বসলে, আগের কক্ষ পরিবর্তন করে চলে আসবে ডান দিকে।

চাঁদের বৃত্তাকার কক্ষপথে ঢোকার আগেও হয় রকেট ছোঁড়া কি নির্দিষ্ট লাল ঘরে বসা দরকার। না হলে, মহাকাশে পথভ্রষ্ট।

তবে, একবার চাঁদের কক্ষে পাক খেতে শুরু করলে, চাঁদে অবতরণ নিশ্চিত। তবে সেটা কতক্ষণে ঘটবে কেউ জানে না। একটি তীরচিহ্ন দিয়ে চাঁদে অবতরণের পথটি দেখানো হয়েছে। যে-ঘর থেকে এই পথের শুরু, নভোযান সেই ঘরে এসে বসতে পারা মানেই চাঁদে এসে নামা।

ছক্কার দানের ওপর নভোযানের এগিয়ে চলা নির্ভর করছে ঠিকই, কিন্তু নভোযান চালকের বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাবে নিজের রকেট দুটি ঠিক সময় ও সুযোগমতো ব্যবহারের মধ্যে।

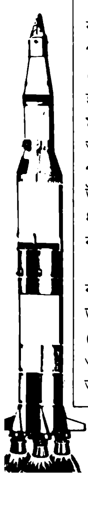

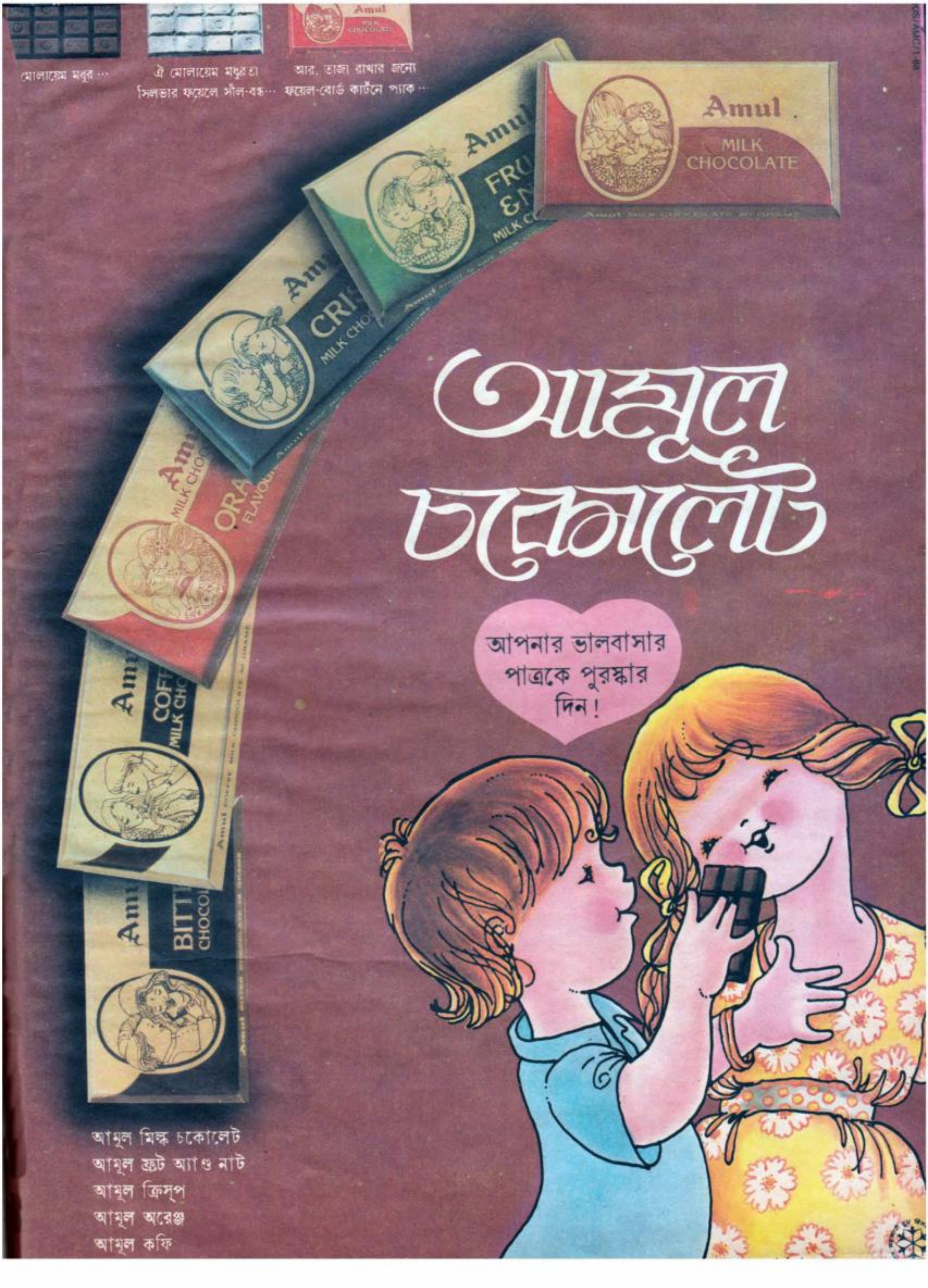
মোলায়েম মধুর ···
ঐ মোলায়েম মধুরতা
সিলভার ফয়েলে সীল-বন্ধ···
আর, তাজা রাখার জন্যে
ফয়েল-বোর্ড কার্টনে প্যাক ···
Amul
MILK
CHOCOLATE
আমুলে
চকোলেট
আপনার ভালবাসার
পাত্রকে পুরস্কার
দিন !
আমূল মিল্ক চকোলেট
আমূল ফ্রুট অ্যাণ্ড নাট
আমূল ক্রিস্‌প
আমূল অরেঞ্জ
আমূল কফি

ANANDAMELA 27 DECEMB
WB CC-264 MH-BY-SOUTH 683 TN MS(C) 7

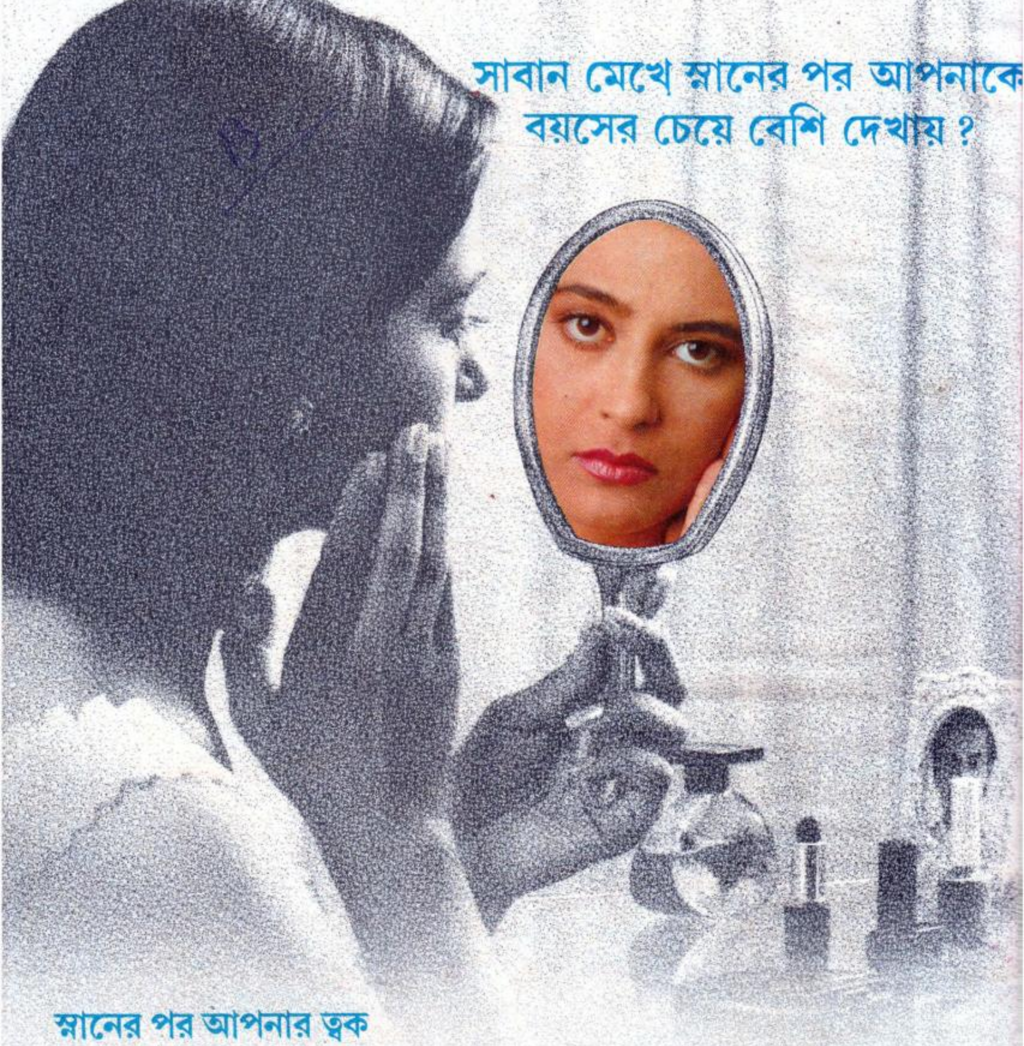

স্নানের পর আপনার ত্বক
কোমল তরুণ লাবণ্যে ঝল্‌মল্ করে তুলুন।

"সাবানে-সাবানে এত তফাৎ
আমি ভাবতেই পারি নি"
—প্রখ্যাত মডেল অনু আহুজা

অনেক সাবান দেখতে ভালো, কিন্তু আপনার ত্বকের পক্ষে খুব খারাপ। পরিষ্কার করতে গিয়ে ত্বক ক'রে তোলে রুক্ষ (প্রতিবার স্নানের পর মনে হয় ত্বক খসখসে লাগছে, ত্বকে টান ধরেছে)। ত্বক বেশিদিন রুক্ষ খসখসে থাকলে শেষে কুঁচকে যায়, ত্বকে বয়সের ছাপ পড়ে।

আসল কোল্ড ক্রীম-এর গুণে ভরা পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীম-এর স্নিগ্ধ পরিচর্য্যায় আপনার ত্বক হবে কোমল, তরুণ লাবণ্যে ঝলমল্।

এখন থেকে পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীম সাবান মেখে স্নান করুন...দেখুন আপনার ত্বক হয়েছে পরিচ্ছন্ন, সতেজ, চিরনবীন।

পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীম সাবান

আসল কোল্ড ক্রীম-এর গুণে ভরা